।। নজরুল ইসলাম ।।

এ. জে. ফরিদুর রহমান
২য় বর্ষ সাহিত্য
১৯৫৫

নজরুল ইস্‌লাম

॥ নজরুল-কাব্যের পরিচয় ঃ প্রদর্শনী ও বিশ্লেষণ ॥

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

রচিত ঃ সঙ্কলিত ঃ সম্পাদিত

মখদুমী অ্যাণ্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী
বাবুবাজার..............................ঢাকা

প্রকাশক :
মোহাম্মদ কাসেম
মখদুমী অ্যাণ্ড আহ্‌সানউল্লা লাইব্রেরী
বাবুবাজার, ঢাকা

*

শিল্পী : কামরুল হাসান

*

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, তের'শ একষট্টি

*

মুদ্রাকর :
১—১৫ ফর্মা
মডার্ণ প্রিন্টিং প্রেস
মৌলবী বাজার, ঢাকা
অবশিষ্ট অংশ :
১।১ ভিতর বাড়ী লেন, ঢাকা
ইকবাল প্রিন্টিং হাউস-এর পক্ষে
মোহাম্মদ আলাউদ্দীন

*

দাম—পাঁচ টাকা

।। নজরুল ইস্‌লাম-কে ।।

এই বই হাতে পেয়ে একথা ভেবোনা বন্ধু
সহসা সুযোগ পেয়ে কটুকথা ব'লেছি অনেক—
নিকষে সোনার রেখা দেখিবার ইচ্ছা ছিলো,
তাইতো লিখেছি কথা রূঢ়তায় হয়তো পীড়িত।
চোখের দৃষ্টির মতো ঘন কালো মেঘে মেঘে
বিদ্যুৎ নিশ্চয় আছে এই ধারণায়
বজ্রের সহায় চাই, বৃষ্টির আবেশ চাই—
হয়তোবা সর্বনাশ কামনা করেছি।
এই কথা মনে রেখো
তোমারে দেখিতে যেয়ে
ঘাসের সবুজে আমি
আকাশের নীলকে দেখেছি ।।

সৈ. আ. আ.

ঢাকা
১৬ই এপ্রিল, ১৯৫৪

॥ ভূমিকা ॥

এ-গ্রন্থের পরিকল্পনা দ্বিবৎসরাধিক পূর্বের। নানা অসুবিধায় সময়মত প্রকাশ করা হয়নি। মখ্‌দুমী অ্যাণ্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ কাসেমের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ না থাক্‌লে হয়তো বা প্রকাশিতই হতো না।

আমার ছাত্র কল্যাণীয় মোহাম্মদ আবদুল কাইউম গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তুত ক'রেছে এবং গ্রন্থ-পঞ্জী ও জীবন-পঞ্জীর জন্য উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছে। জীবন এবং কর্মক্ষেত্রে তার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

এ-পুস্তকের গ্রন্থ-পঞ্জী প্রধানতঃ কল্‌কাতার বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ পরীক্ষা ক'রে রচিত হ'য়েছে। এ-ছাড়া বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকার সহায়তাও পেয়েছি।

—সৈয়দ আলী আহ্‌সান

বাঙ্গালা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৬ই এপ্রিল, ১৯৫৪

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

পরিচয় ১—৫৮
- আরম্ভ ১
- প্রথম পর্যায় ও বিপ্লবী মন ৮
- 'ভাঙ্গার গান' ৩০
- 'যুগবানী' ৩৩
- নজরুল ইসলামের ছন্দ ৩৯

প্রতিধ্বনি ৫৯—১৪১
- বিদ্রোহী ৫৯
- আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে ৬৫
- বিষের বাঁশী ৬৮
- ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম ৭০
- যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল ৭৪
- পলাতকা ৭৫
- শায়ক-বেঁধা পাখী ৭৭
- চিরশিশু ৭৯
- অ-কেজোর গান ৮০
- কাণ্ডারী হুশিয়ার ৮১
- মানুষ ৮৩
- দারিদ্র্য ৮৬
- বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি ৯০
- এ মোর অহঙ্কার ৯৪

আমি গাই তারি গান ৯৮
সিন্ধু ১০০
দুর্বার যৌবন ১০৫
আর কতদিন ১০৭
আজাদ ১১১
পরিশিষ্ট ১১৫—১৩২
নজরুল জীবন-পঞ্জী ১১৫
গ্রন্থ-পঞ্জী ১১৯
নজরুল-সম্বর্ধনা ১২৬
নজরুলের কয়েকটি রচনা ১২৯
পরিযোজন ১৩৩—১৬৩
‘মরু-ভাস্কর’ ১৩৩
‘বন-গীতি’ ১৪০
‘জুলফিকার’ ১৪৫
‘ফণি-মনসা’ ১৫০
নজরুল ইসলামের কাব্যের ঐতিহ্য ১৫৫
নজরুল ইসলাম সংক্রান্ত আলোচনা ১৬৪
নির্দেশিকা ১৬৬

পরিচয়

আরম্ভ

১

জীবিত থেকেও বর্তমানে নজরুল ইস্‌লাম প্রাণবন্ত মানুষ হিসেবে অস্বীকৃত। তাঁর জীবন অতীতের ক্রমবিলীয়মান জীবনধারায় যে আঁচড় কেটেছে, বর্তমানে তাই আমাদের একমাত্র প্রতিপাদ্য। যা প্রাচীন হয়েছে তাকে ঘিরে একটি স্বপ্নময় মাদকতা আপনা থেকেই গড়ে ওঠে—তাকে আমরা সহজে এড়িয়ে যেতে পারি না। সে আমাদের বারবার ডেকে নিয়ে যায় তা'র পরিবেশের মধ্যে। হয়তো তা' বহুদিনের, হয়তো তা' মলিন, কিন্তু আমাদের প্রহরে প্রহরে তার আবর্ত মিথ্যে হবার নয়।

অতীতের মধ্যে যে মাদকতা, যে সৌন্দর্য আছে, নজরুলকে ঘিরে আজ আমাদের সেই মাদকতা, সেই সৌন্দর্য। এটা আজ স্পষ্ট যে, তিনি আর কবিতা লিখ্‌ছেন না। আকস্মিক শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার আগে থেকেই তিনি কাব্য রচনায় ক্ষান্ত দিয়েছেন। কখনো কখনো হয়তো কিছু লিখেছেন কিন্তু তাতে নিরাভরণ তথ্যেরই প্রকাশ ছিলো শুধু, অক্ষুণ্ণ কাব্যিক-মাধুর্য ছিলো না। একদিন অপরিসীম উদ্দামতায় তিনি যে-জগৎ সৃষ্টি ক'রেছিলেন, উদ্দামতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে-জগতও নেপথ্যে সরে গেল। স্থির প্রশান্ত আকাশে নতুন ক'রে আর মেঘ জম্‌লো না, ঝড়ও এলো না।

সে-জগতের ইতিহাস আমাদের শুন্‌তে ইচ্ছা হয়। অত্যন্ত পুরোনো না হ'লেও তা'তে অতীত বস্তুর মাদকতা আছে। যখন তা' জীবন্ত ছিলো, তখন তা' ছিলো অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল এবং সে-জন্যই বোধ হয় আজ অন্যান্য নতুন বস্তুর সম্মোহনে তা' হয়েছে

মলিন। ক্ষেত্র প্রস্তুত না ক'রে অতর্কিতে যে আলোড়ন শুধুমাত্র মুহূর্তকে স্বীকার ক'রে এসে প'ড়ে—তা' কখনও দীর্ঘায়ু হয় না। আবার সে-রকম অতর্কিতেই নতুন এক আলোড়ন আসে। পূর্বের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে পড়ে—নতুনের আবির্ভাব হয় প্রাণময়। নজরুলের কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ ও অন্তর্ধানের আড়ালে এই বেদনা-দায়ক সত্য বর্তমান!

নজরুলের কবি-জীবন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট ছিলো একদিন; বর্তমানের পটভূমিকায় তা'র পুনরাবির্ভাব না ঘট্‌লেও সে ইতিহাসের পর্যালোচনা চল্‌তে পারে।

একদিন স্থির প্রবহমান সময়কে তিনি আবর্ত-সঙ্কুল ক'রেছিলেন। সে-কাহিনী মিথ্যে হবার নয়।

চিরাচরিত কোমলতাকে তিনি আঘাত করেননি। বেদনা ও করুণতাকে জীবন্ত করেছিলেন সংঘাত ও সঙ্কটের মধ্যে।

তাঁর আবির্ভাব একটি বিশেষ প্রবাহের কেন্দ্রে এক সময়ে একান্ত সত্য ছিলো। সে-তথ্য আজও অপসৃত হয়নি।

বিবর্তমান জগতের কেন্দ্রে সত্যিকার প্রতিভাবানের আসন নিশ্চয়ই রয়েছে—চিরদিনের জন্যই হোক্ বা ক্ষণিকের জন্যই হোক্।

২

বাংলার কাব্যে আত্মনিবেদনের সুর চিরকালই অত্যন্ত দীপ্ত, আত্মপ্রকাশের কথা সেখানে খুবই ক্ষীণ। প্রকৃতির লীলাময় পরিবেশে এখানকার কবি স্রষ্টাকে তার অন্তরের নিবেদন জানিয়েছে। তাঁর আপন যা-কিছু, তা' কিছুই নিজের জন্য থাকেনি। নজরুল ইস্‌লাম এর অনেকটা বিপরীত।

নজরুলের আবির্ভাব রবীন্দ্রযুগে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যখন অত্যন্ত প্রবল, তখন তিনি অতর্কিতে নতুন এক সুর নিয়ে এলেন বাংলার কাব্যে। তাঁর আবির্ভাব প্রতিবাদ হিসেবে নয়, স্বীকৃতি হিসেবেও নয়। কোনো বিচার-বিবেচনার মধ্যে তিনি ধরা পড়েননি।

সময়ের দাবী তিনি মেটাতে চেয়েছিলেন। পরিবেশ যা দাবী করেছিলো, কাছের মানুষের যা ছিল কাম্য—তিনি তাই এনে দিয়েছিলেন। বাংলার কাব্যে তিনি কিছুদিনের জন্য মূল্যবান এক আবর্ত সৃষ্টি ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যুগে অন্য এক কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ। ব্যক্তুৎপ্রেক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ বস্তুধর্মী হ'তে চেয়েছিলেন। নজরুল ছিলেন অত্যন্ত প্রবলভাবে আত্মমুখর। রবীন্দ্রনাথে ছিলো সর্বভাবে মানব জীবনকে স্বীকার। রবীন্দ্রনাথের যুগ-রসে পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে কোনো বিশিষ্টতা কেউ অর্জন করলেও তা' অক্ষয় হতে পারেনি। সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিশিষ্টতা আছে, শ্রেষ্ঠত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু বিরাট মহীরুহের পত্রচ্ছায়ার আড়ালে লালিত হয়েছিলো তাঁ'দের জীবন, তাই তাঁদের স্বকীয়ত্ব স্পষ্টভাবে লোকের কাছে ধরা পড়েনি। যে কারণে নজরুল সকলের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, তা' হ'ল প্রথমতঃ নিপীড়িতদের প্রতি উচ্ছ্বাসময় মমত্ববোধ, দ্বিতীয়তঃ দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি উদগ্র আবেগ।

লাঞ্ছিতজনের জন্য তিনি সর্বদাই করুণা প্রকাশ করেছেন। দুস্থদের জন্য অনুরাগ ছিলো তাঁর অসীম। এই অনুরাগ অশ্রুতে রূপায়িত না হ'য়ে সংঘাতে আবর্তিত হ'য়েছে। নিশ্চিন্তে বেদনাকে তিনি মেনে নেন্‌নি, বিক্ষোভ প্রকাশ ক'রেছেন—আলোড়ন তুলেছেন। মনের স্পৃহাকে দ্বিধাহীন চিত্তে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। কাব্যিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রইল কিনা, সে চিন্তা তিনি করেননি। সুসঙ্গত শব্দ চয়নের দিকে তাঁর মন ছিলো না, বাক্যবিন্যাসের মাধুর্য তিনি গড়ে তুলতে চাননি। যা' চেয়েছেন তা' হ'ল মনের দাবীকে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চকিত কণ্ঠে জানানো। একাজ সবাই পারে না, কেননা তা'দের কাব্য জীবন-ক্ষেত্রে একটি অন্তরাল সৃজন করতে চায়। কাব্য তাদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য নিশ্চিন্ত বিলয়। নজরুলের কাব্যের সঙ্গে কিন্তু নজরুলের জীবন নিবিড়ভাবে জড়িত। সুষমা-

মণ্ডিত একটি ভাবলোক তিনি গড়ে তুল্‌তে চান্‌নি। তাঁর জীবনের অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাস তাঁর কাব্যে ধরা প'ড়েছে। দুস্থ জীবনের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ বেদনাভারাক্রান্ত উচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত হ'য়েছে। এই বেদনা ক্রমশঃ জীবনের সঙ্গে অসহযোগিতার রূপ নিয়েছে। কবি চিন্তা করেননি, বিচার করেননি—সততচঞ্চল মনের দাবীকে মেনে নিয়েছেন। শুধুমাত্র সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর নির্ভরশীল যিনি, তাঁর পক্ষে নিত্য মনের দাবীকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। নজরুলের 'বারাঙ্গনা', 'নারী,' 'কুলী' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর আবেগ-প্রবণ মনের প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য। সাহিত্য-সমালোচক অনেকের বিচারে এসমস্ত কবিতায় তথ্যের অপব্যবহার হ'য়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, লাঞ্ছিতদের প্রতি করুণাদ্রব মনের পক্ষে এ-ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। বারাঙ্গনাদের প্রতি করুণা-প্রবণ হ'য়ে তিনি লিখেছেন ঃ

"কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা,
কে দেয় থুতু ও-গায়ে ?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে
সীতাসম সতী মায়ে।
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা,
মেরী হ'তে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা
বিমল সত্য সেবি ?"

বারাঙ্গনাদের প্রতি এ-প্রশস্তি আমাদের ভালো লাগবে না, এতে অসুস্থ মনেরই পরিচয় ফুটে উঠেছে, কিন্তু আগেই বলেছি যে, আবেগ-প্রবণ মন শুধু মনের দাবীকেই জানাতে পারে, বস্তুর সত্যাসত্য অথবা মনের অবস্থা নিয়ে তর্ক তোলে না। 'কুলী' কবিতার ঃ

"সেদিন দেখিনু রেলে,
কুলী ব'লে এক বাবুসা'ব তারে
ঠেলে দিলে নীচে ফেলে"—

এ-গুলোও রসসিক্ত চরণ নয়। কাব্য হিসেবে উত্তীর্ণ হয়নি। কিন্তু মনের দ্বিধাহীন আকৃতির যদি মূল্য থাকে, তবে এ-গুলোরও মূল্য আছে।

আবার এই আকৃতি কখনো কখনো সত্যিকার কাব্যরূপেও ভাস্বর হয়েছে :

"কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে ?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।"

দীর্ঘ এক দীপ্তিহীন কবিতায় হঠাৎ কখনো কখনো চমকপ্রদ উচ্ছলতা, নিবিড় অমা-যামিনীতে খদ্যোতের প্রভার মতো। এ-কারণেই কোনো এক সমালোচক নজরুলকে বলেছেন, চরণের, কখনো কখনো বা স্তবকের কবি—কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতার নয়।

৩

বাংলার সাহিত্যসাধনায় মুসলমানদের দান স্বল্প নয়। তাঁ'দের সাধনা এক বিশিষ্ট পর্যায় সৃষ্টি করেছে। সে-পর্যায়ে নজরুলের দানও যথেষ্ট, স্থানও অনেক উচ্চে।

মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকগণ গতানুগতিক পথ বেছে নেন্‌নি, আর নিয়ে থাক্‌লেও তাতে স্বাতন্ত্র্য ছিলো কিছুটা।

প্রাচীনকালের সাহিত্য-সাধকদের কথা বল্‌বো না, কেননা তাঁ'দের সময়ের সঙ্গে বর্তমান মুহূর্তের সংযোগ অত্যন্ত নগণ্য। আরাকান রাজদরবারে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিলো, তা'র সঙ্গে বাংলার মাটির সংশ্রব ছিলো না এবং তা'র প্রভাবও বিস্তৃত হয়নি। সীমাবদ্ধ পরিবেশে একান্তে তাঁরা সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন, অত্যন্ত মধুর তার সুর। কিন্তু ঐ মাত্রই। তা'র রেশ পরবর্তী যুগের গীতিকারদের কানে এসে পৌঁছোয়নি। প্রস্ফুটিত প্রসূন লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝ'রে পড়েছিলো, তা'কে আজ নতুন ক'রে আবিষ্কার কর্‌তে হচ্ছে।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সাহিত্য-সাধকদের ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস নেই। শুধু উনিশ শতকের

একেবারে শেষের দিকে সাহিত্য ও কাব্যগত নতুন এক আবর্ত গড়ে উঠে—যার জের এখনও চল্‌ছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে কায়কোবাদ থেকেই এর শুরু। ঐতিহাসিক চেতনার উন্মেষ হয় তাঁর মধ্যেই প্রথম। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক চেতনা অত্যন্ত স্থূল, তা'তে রসানুভূতির প্রশ্রয় নেই। তিনি ইস্‌লামের অতীত কাহিনী স্মরণ ক'রেছেন মাত্র। কায়কোবাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই এলেন। মোজাম্মেল হক, মীর মোশার্‌রফ হোসেন ও আরও অনেকে। ইস্‌লামের অতীত কাহিনী এঁদের কাব্যের উপাদান জুগিয়েছে মাত্র। মোজাম্মেল হক ছিলেন উচ্ছ্বাস-প্রবণ। মুসলমানদের দুঃখ-দৈন্যের কথা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি সেই শোকগাথা গেয়েছেন। আদর্শগত সম্বল ছিলো তাঁর কম, ভাবের আতিশয্য ছিলো বেশী।

মোশার্‌রফ হোসেন সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

এঁদের পরেই যাঁরা এলেন, নতুন ইংরেজী শিক্ষার আলোক তাঁ'দের মধ্যে ছিলো। তাই অতীতের দাবী মিটিয়েও নতুনকে তাঁ'রা মেনে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাব্যে ছিলো স্পৃহার সুর। তাঁ'দের অনুভূতির উদ্ভব হয়েছিলো স্পষ্ট চেতনলোক থেকে। এঁদের প্রভাব বেশী দিন টিকে থাকেনি।

সবশেষে এলেন নজরুল ইস্‌লাম। তিনি অতীতকে প্রত্যক্ষ করলেন নতুন আলোকে। স্তব্ধ মৃত অতীতের চিত্র তিনি আঁকেননি—অতীতের প্রাণবন্ত মুহূর্ত তাঁর কাব্যে রূপ পেয়েছে। পরিবেশের সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে সে অতীত জীবন্ত হয়েছে। অতীতের এ নব রূপায়ণ বিভিন্ন ধারায় নজরুলের কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও আছে স্বপ্নময় ভাবালুতা, কোথাও আছে স্মরণ, কোথাও আছে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে বিচার। সমস্ত কিছু নিয়ে তিনি উজ্জ্বল এক জগতের পরিকল্পনা করেছেন। বেদনার বিকল্পহিসেবে নয়—সহজভাবেই সমস্ত কিছুকে তিনি স্বীকার ক'রেছেন।

আবছুল ওছুদ বলেছেন যে, নজরুলের মধ্যে রোমান্টিসিজম ও রিফরমেশন ওতপ্রোতভাবে বর্তমান ছিলো। কথাটি অনেকটা সত্য। প্রাচীনের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে রোমান্টিসিজমের রেশ বর্তমান, আবার বস্তুকে নতুন করে গ'ড়ে তুল্‌বার মধ্যে রিফরমেশনের প্রকাশ আছে। এ দ্বৈত-সুরে নজরুলের কাব্য কখনও গতিহারা হয়নি।

‘নজরুলই আমাদের প্রথম জাতীয়-কবি।’

টি. এস. ইলিয়ট্ কবিতার তুলনা করেছেন, ভগ্ন পাষাণ ফলকের উপর নির্নিমেষ সূর্যরশ্মির সঙ্গে। প্রত্যহের সম্পদ যেখানে যুগাতীত এক অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে দীপ্ত হয়; যেখানে তা'র মুহূর্তের মূল্য স্বপ্নের দিগন্তে ভাস্বর হ'য়ে উঠে; যেখানে বিগত, অধুনা ও আগামীকালের ঐশ্বর্য একই সঙ্গে সঞ্চিত হ'য়েছে—সেখানেই স্রষ্টার নয়ন উন্মীলিত হয়। "I am today and heretofore but something is in me that is of the morrow, and the day following, and the hereafter"—ঠিক এ-কারণেই Waste Landএর নায়ক টিরেসিয়াসের কাছে অতীত অত্যন্ত পরিচিত, বর্তমান প্রত্যক্ষ এবং ভবিষ্যৎ দ্বিধাহীন সৌকর্যে স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যাকে ব'লেছেন, কথা শেষ হ'লেও বলা শেষ হয় না, সত্যিকার কবিতা হচ্ছে তাই। সাধারণ পরিচিত পরিবেশের মধ্যে এক স্মরণীয় ইতিহাস সৃজন করতে হবে, যে ইতিহাসে বস্তু ও প্রকৃতি মুখর হবে না, কিন্তু নিত্যকালের সংবাদ বস্তু-আশ্রিত হ'য়েও জীবন্ত থাক্‌বে। কীট্‌স্ যখন বলেন:

"Bright star, would I were steadfast as thou art—
Not in lone splendour hung aloft the night
And watching with eternal lids apart,
Like nature's patient, sleepless Eremite."

সেখানে ব্যক্তির আকৃতি নিত্যকালের মানব-মনের সম্পদ হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। তমসাবৃতা রজনীর নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের লক্ষ্য কবির মনে যে সম্ভাবনা জাগিয়েছে, তা'র স্বরূপে মুহূর্তের সত্যই শুধু উজ্জ্বল নয়, সেখানে চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির সত্য ধরা প'ড়েছে। নিরবধিকালের স্বাক্ষর এখানে আমরা পাই, তাই

ক্ষণকালের জীবন এখানে নেই, অনাবৃত নয়নের দৃষ্টিতে অনেক দিনের ইতিহাস স্বচ্ছ হ'য়েছে। (অথবা :

"সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী !
সত্যেরে চাহিনা তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী !
স্বপনের মণিহারে হেরি তাঁ'র সীমন্ত-রচনা।
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ব লাবণি !
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ ? কে করে শোচনা !
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা !"
[মোহিতলাল]

উভয় কবিতার ভাবোন্মাদনার উৎস একই। চিরন্তনী প্রহেলিকা নারীকে কেন্দ্র ক'রেই এখানে বিচিত্র কল্পনার উন্মেষ ঘটেছে। চিরকাল বেঁচে থাকার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুতে বিলয়ের প্রশ্ন উঠেছে কিন্তু তবুও কবি প্রিয়ার সুকুমার পয়োধরকে উপাধান হিসেবে রেখে বিশ্রাম খুঁজেছেন। অনন্ত দুঃখের মধ্যেও আনন্দের অন্বেষণ ক্ষান্ত হয়নি। অথবা :

"যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে !
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ;
বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজি,
(বনরত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে।
চির পরিধান মম বাকল, ঘৃণিনু
তাহায় ! চাহিনু' কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !

ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে !
হায়রে অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি !”

[মধুসূদন]

যে-কামনা ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে গুঞ্জরিত হয়েছে, ব্যক্তির মধ্যেই তা'র নির্বাণ ঘটেনি ; তাই এককালের একজনের প্রতি নিবেদিত প্রেম সর্বকালের নারীর ব্যাকুলিত চিত্তের সম্পদ হ'য়েছে। পরিবেশকে ভুলে, সম্ভ্রমকে ভুলে, বিবেচনাকে অস্বীকার ক'রে, যে-মুহূর্তে মানুষ কামনার বিষবাষ্পে সর্বঅঙ্গ জর্জরিত ক'রে সন্ধ্যার কুহেলিকার মতো রক্তিম দিগন্তকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়, এ সেই মুহূর্তের কবিতা। এ সেই মুহূর্তের সর্বনাশের কথা যখন ঃ

“কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল-দীঘিতে সাতশ' হ'য়েছে এক আকাশের চাঁদ !
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশী !
দু'দিনে আতশী ফেরেশ্‌তা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরী-চোখের চতুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে !

* * * *

অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোযখের নার-ভীতি
মাটির সোরাহী মস্তানা হ'ল আঙ্গুরী-খুনে তিতি—।”

[নজরুল ইস্‌লাম]

যদিও এখানে সর্বত্র একই সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত হয়নি, তবুও লাস্য-লীলার মোহমুগ্ধ প্রহরের একটি পরিপূর্ণ আভাস আমরা

এখানে পাই, যা' পরিচিত দিগন্ত অতিক্রম ক'রে অনন্তকালের স্বপ্নের কাহিনীতে জেগে উঠেছে।

এই অক্ষয় কাব্য-রস নজরুল ইস্‌লামের রচনায় কতটা র'য়েছে তা' ভেবে দেখ্‌বার মতো।

যে-কারণে নজরুল ইস্‌লাম সর্বপ্রথম খ্যাতি লাভ করেন তা হ'ল যুগের সাময়িক প্রবাহের প্রতি উৎকণ্ঠা। বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে যে আলোড়নের সূচনা হ'য়েছিলো, নজরুল ইস্‌লাম সেই চঞ্চলতার উৎস সলিলে অবগাহন করেছিলেন। স্নিগ্ধ মনোরম যে-শান্ত স্রোতোধারা বাংলার মাটিকে চিরকাল সঞ্জীবিত ক'রেছে, সেই স্রোতোধারার প্রবাহ-পথে তিনি উপলখণ্ডের বাঁধ রচনা করেন। এভাবে হঠাৎ প্রতিহত হওয়ায় সাময়িকভাবে এই পানির নহর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে। "বিদ্রোহী" সেই উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি। নজরুলের খ্যাতি এই কবিতার জন্যই। সাধারণ্যে তিনি পরিচিত হ'লেন এই আক্ষেপ ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি গিয়েছিলেন কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। ধ্বংসের সরঞ্জাম তিনি দেখেছিলেন কিন্তু সর্বনাশ ও বিলয়ের গতিবেগ ও স্ফূরণ কখনো তাঁ'র দৃষ্টিপথে আসেনি। তাই পরিচিত পৃথিবীতে যা'র রূপ দেখা দিল না, কল্পনার অস্বাভাবিক সৌন্দর্য হ'য়ে মানুষের গৃহীত চিন্তাধারায় তা' শৃঙ্খলার ন্যূনতা ঘটালো। "বিদ্রোহী" সংযত শোভার মধ্যে এক অনাসৃষ্টি—লক্ষ্যভ্রষ্ট যৌবনের গতিচঞ্চলতা। নজরুলের পরিচয় তাই খুঁজ্‌তে হবে অন্যক্ষেত্রে। প্রথম জীবনের কাব্য নজরুলকে পরিচিত ক'রেছে কিন্তু স্থৈর্য দেয়নি। তাঁ'র গতিপথে বৈশাখের উচ্ছৃঙ্খলতা নেমেছে কিন্তু পরিশেষে কোনো স্বীকারুক্তি রেখে যায়নি। যে বিদ্রোহ শুধু আবেগ, সে কোনো ইতিহাস সৃজন করে না—আবর্ত রচনা করে মাত্র। নিট্‌শে বলেছেন: One must still have chaos in one to give birth to a dancing star, কিন্তু যদি

নবসৃষ্টির আবেদন কারো মধ্যে না থাকে তবে শুধু chaos বিশৃঙ্খলায় সর্বনাশই আসে—জীবনের অর্থ থাকে না, জীবন হয় নিশ্চিন্ত প্রহেলিকা। এ আবেদন যেখানে জীবনকে ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে সেখানেই বলা সম্ভব—"Lo, I am a herald of the lightning, and a heavy drop out of the cloud." (Nietzsche)। "বিদ্রোহী" কবিতার শেষে যে ইচ্ছার কথা কবি প্রকাশ ক'রেছেন, অর্থাৎ উৎপীড়িতের বেদনাভারাক্রান্ত মনে যে অভয় তিনি আন্‌বেন, সম্পূর্ণ কবিতার শেষে তা' অন্যায়ভাবে সংযোজিত হ'য়েছে। কোলেরিজের "He prayeth best who loveth best"-এর মতো "যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না…আমি সেইদিন হব শান্ত"-এর আবেদনও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সম্পূর্ণ কবিতার গতিবেগ থেকে এই ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হয়নি। কিন্তু যেখানে মনের ইচ্ছা আবেগের সত্যকেই স্পর্শ ক'রেছে শুধু, কোন গভীর আবেদন না থাকা সত্ত্বেও তা' পাঠযোগ্য হ'য়েছে:

"আজ আস্‌ল ঊষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আস্‌ল নিকট, আস্‌ল সুদূর,
আস্‌ল বাঁধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগ্‌লা-গাজন-উচ্ছ্বাসে!
ঐ আস্‌ল আশিন শিউলি শিথিল
হাস্‌ল শিশির দুব্‌ঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ জাগ্‌ল সাগর, হাস্‌ল মরু,
কাঁপ্‌ল ভূধর, কানন-তরু,
বিশ্ব-ডুবান আস্‌ল তুফান উছ্‌লে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বামপাশে!"

অথচ কবিতা হওয়া সত্ত্বেও শব্দ-বিন্যাসের ও ছন্দে স্বরাঘাতের প্রাধান্যের দরুণ এ কবিতা ক্ষণকালের জন্য মোহনীয় এক আবর্ত সৃষ্টি করে মাত্র। এখানে herald of the lightning-এর আবেদন নেই। আবার অন্যদিকে ঃ

> "যুগে যুগে ধরা ক'রেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন—
> মানেনি কখনো, আজো মানিবেনা বৃদ্ধত্বের এই শাসন!
> আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান,
> সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।
> যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বের দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—
> ওরা দিক গালি মোরা হাসি' খালি বলিব 'ইন্না···
> রাজেউন্!"

এখানে তথ্যের ছন্দোগত রূপায়ণ র'য়েছে, কিন্তু কাব্য নেই। ভাষণ সমৃদ্ধ নয়, আবেগ দ্বিধাহীন নয় শুধু একটা বক্তব্য দুর্বল শব্দবিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। আকাশে মেঘের আস্তরণ নির্দিষ্ট গতিহীন অবিন্যস্ত, কিন্তু তা'র প্রকাশে ঘনায়মান অন্ধকারের সহজ বৈচিত্র্য আছে। এই সহজতার জন্যই তা' সুন্দর। নজরুল ইস্‌লামের উপরের উদ্ধৃতিতে সেই সহজতা নেই। একটি আবেগ একান্তভাবে দীন-শব্দব্যূহের আবরণে গতিহারা হ'য়েছে। যৌবনের আবেগ কোনো পরিসরকে স্বীকার করেনা, তা'র ধর্মই হ'ল বন্ধনচ্যুত জীবনের অভিলাষ। পাষাণ বিদীর্ণ ক'রে যেমন অশ্বত্থ তরু আকাশের দিকে তা'র শীর্ষ তুলে দেয়, যৌবনের আবেগও তেমনি সীমাবদ্ধ জীবনের আবেষ্টনী ভেঙ্গে দুনিয়ার সর্বক্ষেত্রে আপনাকে বিকশিত ক'রতে চায়। যে ভাষায় এ-আবেগ কবি প্রকাশ করবেন তা'রও একটা বিশিষ্ট রূপ থাকবে, তা'র ছন্দের তরঙ্গেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। মধুসূদনের "সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু বীরচূড়ামণি" উদাত্ত সুর-ব্যঞ্জনায় যে বিপুল ট্রাজিক কল্পনার উদ্গাতা হ'য়েছে,

রবীন্দ্রনাথের "যুদ্ধ যখন ক্ষান্ত হ'ল বীরবাহু বীর যবে" সেই কল্পনাকে পরিহাস ক'রেছে মাত্র। শব্দবিন্যাস, শব্দচয়ণ ও ছন্দ-তরঙ্গের এই গোপন-ইতিহাস নজরুল ইস্‌লামের জানা থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র তিনি তা' প্রয়োগ করতে পারেননি। যদি পারতেন তবে তিনি লিখ্‌তেন না ঃ

"তোদের শুভ্র গায়ে হানে ওরা আপন গায়ের গলিত পাক,
যার যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গের শিশু সহিয়া থাক্।
শাখা ভ'রে আনে ফুল-ফল, সেথা নীড় রচি' গাহে পাখীরা গান
নীচের মানুষ তাই ছোঁড়ে ঢিল, তরুর নহে সে অসম্মান।
কুসুমের শাখা ভাঙে বাঁদরের উৎপাতে, হায়, দেখিয়া তাই—
বাঁদর খুশীতে করে লাফালাফি, মানুষ আমরা লজ্জা পাই।"

শুধুমাত্র দুর্বল শব্দসমষ্টির সংযোজনায় এই কবিতা বিপুল আবেগ প্রকাশের অন্তরায় হ'য়ে প'ড়েছে। কবি পর্বভূমক গীতিচ্ছন্দের ছয় মাত্রার দোলা এখানে আন্‌তে চেয়েছেন, কিন্তু প্রতি চরণের শেষের ছন্দোতিরিক্ত বা hypermetric পদের মাত্রা পাঁচ হওয়ায় প্রত্যেক সম্পূর্ণ চরণের প্রতি পর্বের দোলা আরও দ্রুত লয়ের হয়েছে। লঘুভাব প্রকাশের জন্য ছন্দের এই দ্রুত লয় অনেক সাহায্য করে, কিন্তু বিপুল প্রসারী কল্পনা এখানে আশ্রয় পেতে পারে না। এই ছন্দোতিরিক্ত পদ যেখানে দু'মাত্রার হ'য়েছে সেখানে ছন্দের লয় হ'য়েছে দীর্ঘ ও ভাবের ব্যঞ্জনা হ'য়েছে গভীর। নজরুলের রচনাতেই তা'র নজির রয়েছে ঃ

"সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে'
জীবনোদ্বেগে, তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মাণিক আহরি আনে যারা খুঁড়ি পাতাল যক্ষপুরি ;
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।"

এখানে দীর্ঘ লয়ের জন্য গীতিচ্ছন্দেও পয়ারের গম্ভীর চরণক্ষেপণের আভাস পাই। ছন্দের এই সৌষ্ঠবের জন্য ভাবের প্রগাঢ় সৌকুমার্য

এখানে স্পষ্ট হ'য়েছে। কিন্তু বক্তব্যের আবেদনের প্রকারভেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী, স্বাভাবিকভাবে এ-সত্য নজরুল ইস্‌লামের কাছে ধরা দেয়নি। যদি ধরা দিত, তবে স্মরণীয় কাব্যপঙ্‌ক্তি তাঁর যথেষ্ট থাক্‌তো। কখনো কখনো সুন্দর কবিতা তিনি লিখেছেন কিন্তু সেগুলো কখনো মহান কাব্যসম্পদ নয়। নভোচারী মুক্ত বিহঙ্গমের মতো নিঃশঙ্ক গতিবেগ “বিদ্রোহী”র অনেক পঙ্‌ক্তিতে পাই, কখনো কখনো কুশলী শিল্পীর পরিচয়ও মেলে অনেক চরণ ও স্তবকের গঠন-নৈপুণ্যের মধ্যে, কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতায় একটি সংহত ও সুস্পষ্ট ভাবগাম্ভীর্যের প্রকাশ ঘটেনি। যে জীবন-চেতনা ও ভাবনাদর্শ থেকে সত্যিকার কাব্যের উন্মেষ, তা'র অভাব এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট, তাই মৃত্তিকায় কিশলয়ের উদ্গম হ'য়েছে কিন্তু বৃহৎ অরণ্যানীর আভাস জাগেনি। এর চেয়ে বরঞ্চ বিদ্রোহের আদর্শসূচক সার্থক কাব্যপঙ্‌ক্তি “পূজারিণী”তে রয়েছে :

“জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক!
আন্ তোর বহ্নি-রথ, বাজা তোর সর্বনাশা তূরী!
হান্ তোর পরশু-ত্রিশূল। ধ্বংস কর্ এই মিথ্যাপুরী।
রক্ত-সুধা-বিষ আন্ মরণের ধর টিপে টুঁটি!
এ-মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক্
কুটি কুটি!”

এখানে প্রণয়ের স্বস্তির অবস্থা থেকে বিরহ-মুহূর্তের মানসিক অস্থিরতায় উপনীত হবার কাহিনীর স্বাক্ষর রয়েছে। অতিরিক্ত বেদনার বিকল্প হিসাবে গ্রহণ ক'রলে এখানে আমরা একটি আন্তরিক অনুভূতির পরিচয় পাই। আন্তরিকতার জন্যই এ-কয়টি চরণ কাব্য হিসেবে গ্রহণীয় হ'য়েছে। বিহারীলালও “সারদামঙ্গলে” অনেক

আকাঙ্ক্ষার শেষে অপ্রাপ্তির বেদনা থেকে উদ্ভূত মানসিক বিশৃঙ্খলার কথা ব'লেছেন :

"আমার এ বজ্র-বুক,
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ,
দাও, দাও বসাইয়ে, এড়াই যন্ত্রণা !
সমুখে আরক্তমুখী,
মরণে পরম সুখী,
এ নহে প্রলয়-ধ্বনি, বাঁশরী-বাজনা !"

"বিদ্রোহী"র মূলে এমন কোনো মানসিক জটিলতার ইতিহাস নেই। আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের বিবিধ বাসনার দীর্ঘ বিবৃতি মাত্র। সমুদ্রের অশান্ত জলকল্লোল তটভূমিকে দুর্দমনীয় আবেগে অনুক্ষণ লাঞ্ছিত ক'রে যাচ্ছে কিন্তু তাতেও একটা সত্য ও সৌন্দর্য আছে। সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত আবেগ তা'র স্বাভাবিক ধর্মেরই অনুসঙ্গী। কিন্তু "বিদ্রোহী"তে যৌবনের আবেগ রূপ পায় নি। "বিদ্রোহী" অক্ষয় কাব্য হ'তে পারে নি। হয়তো বা ঘনমেঘের স্তর-ভেদী বিদ্যুৎচমকের মতো সুন্দর কাব্য-পঙ্‌ক্তি আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু তা'র আবেদন স্থায়ী নয়। যেমন :

"আমি কভু প্রশান্ত—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী !
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল"

অথবা :

"আমি উত্তর বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণুবীণে গান গাওয়া
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা, আমি রৌদ্র-রুদ্র-রবি
আমি মরু-নির্ঝর ঝর ঝর, আমি শ্যামলিম ছায়া-ছবি।"

অথবা :

"আমি ইন্দ্রাণি-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য !"

এ-কয়টি উদ্ধৃতিতে শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য আছে কিন্তু জীবনের সত্য নেই।

"বিদ্রোহী"কে Walt Whitman-এর Song of Myself-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। Whitman-এর কল্পনার ব্যাপ্তি অসাধারণ, জীবন-চেতনাও অসীম পরিসরের। সেখানে ব্যক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে মানবাত্মা প্রধান হ'য়েছে। ব্যক্তির অস্তিত্ব সেখানে বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে প্রান্তরের তৃণাঙ্কুর থেকে উর্ধ্ব-নীলিমার গ্রহলোক পর্যন্ত আপনাকে পরিব্যাপ্ত করে। আপন অস্তিত্বের স্বীকৃতির কথাই তিনি ব'লেছেন :

"I exist as I am, that is enough,
If no other in the world be aware I sit content,
And if each and all be aware I sit content.
One world is aware and by far the largest to
me, and that is myself,
And whether I come to my own to-day or in
ten thousand or ten million years,
I can cheerfully take it now, or with equal
cheerfulness I can wait.
My foothold is tenon'd and mortis'd in granite,
I laugh at what you call dissolution,
And I know the amplitude of time."

কিন্তু "বিদ্রোহীতে" স্থূল বক্তব্য আছে, অনুভূতির শিখায় প্রজ্বলন্ত জীবনের স্বাক্ষর নেই। বিদেশী কবির পদচিহ্ন ধ'রে

অগ্রসর হ'য়েও শেষ পর্যন্ত সমস্ত বক্তব্য আকুল আক্ষেপে পরিণত হ'য়েছে। Whitman-এর "I am satisfied, I see, dance, laugh, sing," নজরুলের কবিতায় রূপ নিয়েছে ঃ

"আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ !"

বিলয় ও নব-অভ্যুদয়ের সম্মিলিত বিকাশের কথা Whitman-এর শব্দ সংযোজনায় যে ভাব-ব্যঞ্জনার রূপ নিয়েছে, নজরুল ইস্‌লামের মধ্যে একই উক্তি শ্লথ বিবৃতি হ'য়েছে মাত্র। একজনের ভাষায় "I pass death with the dying and birth with the new-wash'd babe" অন্যজন সে কথাই ব'লেছেন "আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান।"

Whitman-এর ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ সার্থক হ'য়েছে। তিনি সেই ক্ষেত্রের সন্ধানী যেখানে মানুষের আদিম অনুভূতি স্বপ্ন রচনা করে; সেখানে সময়, পরিবেশ ও দ্বিধাহীন জিজ্ঞাসা একই সঙ্গে নতুন সম্ভাবনায় আবর্তিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ যেক্ষেত্রে পরিচিত ইতিবৃত্তের সমাপ্তি দেখে, তিনি সেখানে অক্ষয় মোহনীয়তা এনেছেন। "ছায়ালোকের অন্তরাল থেকে যে অপরিচিত আকৃতি জেগে উঠেছে, সে বিনত হ'য়েছে আমার কাছে। দৃষ্টির শেষ সীমায় আমি সৃষ্টির পূর্বাহ্নের নিঃস্বতা দেখেছি। এই নিঃস্বতার মধ্যেও আমি একদিন বর্তমান ছিলাম।"

গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মানব-জীবন সম্পর্কে অক্ষয় মমত্ববোধ ছিলো ব'লেই তিনি শুধু বিজয়ীর বন্দনা-গান রচনা করেননি, বিজিতও তাঁর প্রীতির অংশ পেয়েছে। তাঁর ধারণায় পরাজয়েও অপমান নেই কেননা "battles are lost in the same spirit in which they are won.," জয়ের পূর্ব-মুহূর্তের ইতিহাস পরাজয়ের পূর্ব-মুহূর্তের

ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র নয়। সংগ্রামের পথে, নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হওয়াটাই বড় কথা, তাই:

"Vivas to those who have fail'd
And to those whose war-vessels sank in the sea
And to those themselves who sank in the sea!
And to all generals that lost engagements,
and all overcome heroes!
And numberless unknown heroes equal to
the greatest heroes known!"

এ-আদর্শকে নজরুল ইস্‌লাম গ্রহণ ক'রেছেন "সন্ধ্যার" একটি কবিতায়। দুর্গম পথে দুর্দমনীয় আবেগে যে-দুরন্ত পথিক অগ্রসর হ'লো কিন্তু জয়যুক্ত হ'য়ে ফিরে এলো না তা'কে কবি প্রশস্তি দিচ্ছেন:

পরবর্তিতে হলেও
[illegible]
[illegible]

"—সে দিন নিশীথ বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা
প্রভাতে সে আর ফিরিলনা কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'।"

Whitman-এর প্রভাব নজরুল ইস্‌লামের উপর অত্যন্ত বেশী স্পষ্ট, দীপ্ত ও প্রত্যক্ষ। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও যৌবনের আবেগ যেখানে তাঁর কাব্যের উপপাদ্য হ'য়েছে, সেখানেই তিনি Whitmanকে অনুসরণ ক'রেছেন নিঃসঙ্কোচে। এ অনুসরণের মধ্যে গ্লানির কিছু থাকতো না যদি তা' শুধুমাত্র ভাবগত একাত্মতা বুঝাত। আমরা সেক্ষত্রে বলতাম যে, উভয় কবির মধ্যে একটি আদর্শগত ঐক্য আছে। কিন্তু নজরুল ইস্‌লাম শুধুমাত্র যে, অনুসরণ ক'রেছেন তাই নয়, তিনি অনুকরণ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অনুবাদও করেছেন অথচ তার স্বীকৃতি কোথাও নেই। "জিঞ্জীর" গ্রন্থের "অগ্র-পথিক" কবিতাটি সাধারণ্যে অত্যন্ত বেশী পরিচিত। অসাধারণ গতিবেগ, ছন্দের দ্রুত লয় ও সম্মিলিত কণ্ঠোপযোগী শব্দবিন্যাসের জন্য কবিতাটি আমাদের অত্যন্ত

প্রিয়। সংস্কারবিমুক্ত মন নবসৃষ্টির উন্মাদনায় চিরাচরিত নীতিকে অগ্রাহ্য ক'রেছে, চিরদিনের গৃহীত ব্যবস্থাকে অস্বীকার ক'রেছে এবং একই সঙ্গে সৃষ্টির উদ্গম ও বিকাশ দেখ্‌তে চেয়েছে। অথচ এত সুন্দর কবিতাটি নজরুল ইস্‌লামের নিজস্ব নয়। কবিতাটি Whitman-এর "Birds of Passage" গ্রন্থের "Pioneers! O Pioneers!" কবিতাটির ভাষান্তরিত রূপ মাত্র। দুটি কবিতা পাশাপাশি রেখে পড়লে অনুবাদের তথ্যটি স্পষ্ট হবে।

ইংরেজী কবিতার প্রথম স্তবক:

"Come my tan-faced children,
Follow well in order, get your weapons ready,
Have you your pistol? have your sharp-edged axes?
Pioneers! O Pioneers!"

বাংলা কবিতার প্রথম স্তবক:

"অগ্রপথিক হে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্‌রে চল্!
রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্ ভাইরা মোর
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর!
রাখ্ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান,
হান্‌রে নিশিত পশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ!
কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর্ কদম চল্‌রে চল্॥"

ইংরেজীর অল্প পরিসরের অনেক কথা বাংলার দীর্ঘ পরিসরে স্বল্প কথায় পরিণত হ'য়েছে। অনুবাদেও যথেষ্ট দৈন্য পরিস্ফুট হ'য়েছে। "Come my tan-faced children" বাংলায় রূপ নিয়েছে "রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্ ভাইরা মোর"; "Follow well in order" এর বাংলা হ'য়েছে "জোর কদম চল্‌রে চল্" ; "Get your weapons ready" বাংলায় হ'য়েছে "রাখ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান" আর সর্বশেষ Pioneeers-এর বাংলা "অগ্রপথিক রে সেনাদল।" ইংরেজী কবিতার দ্বিতীয় স্তবক:

"For we cannot tarry here,
We must march my darlings, we must bear the brunt of danger,
We the youthful sinewy races, all the rest on us depend,
Poineers ! O Pioneers !"

বাংলা কবিতার দ্বিতীয় স্তবক:

"কোথায় মাণিক ভাইরা আমার সাজরে সাজ!
আর বিলম্ব সাজেনা, চালাও কুচকাওয়াজ!
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।
অগ্রপথিক রে যুবাদল,
জোর্ কদম চল্‌রে চল্॥"

"We must march, my darlings" বাংলায় রূপ নিয়েছে "কোথায় মাণিক ভাইরা আমার সাজরে সাজ"; "We must bear the brunt of danger" বাংলায় হ'য়েছে "বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন" এবং We the youthful sinewy races, "আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ"।

তৃতীয় স্তবকে বিদেশী কবি প্রতীচির যুবাশক্তির জয়গান ক'রেছেন —তারা চঞ্চল, কর্মদক্ষ, মানুষিক গর্ব ও বন্ধুত্বের আবেগে উজ্জ্বল, সর্বজনের সম্মুখগামী অগ্রপথিক। নজরুল ইস্‌লাম Western youths কে "প্রাচীর তরুণে" রূপান্তরিত ক'রেছেন, কিন্তু প্রতীচির

তরুণদের প্রতি আরোপিত বিশেষণগুলি সর্বাংশে বজায় রেখেছেন। শুধুমাত্র "মরুসঞ্চর গতি-চপল" কথাটি নজরুল ইস্‌লামের নিজস্ব। কথাটি অবশ্য সুন্দর—দক্ষ শিল্পীর পরিচয় বহন করছে।

পরবর্তী স্তবকে মূলের সৌন্দর্য ভাষান্তরিত হ'য়ে অব্যাহত থাকেনি। মূলে যে জিজ্ঞাসা র'য়েছে, আবেগপ্রবণ মনের নতুন পথ গ্রহণের যে উৎকণ্ঠা ও স্পৃহা র'য়েছে,—বাংলায় তা স্থির অগভীর ভাষণে পরিণত হ'য়েছে। বিদেশী কবির উক্তিতে পাই: সমস্ত প্রাচীন জাতি কি গতিহীন স্তব্ধ হ'য়েছে? তা'রা কি তাদের শিক্ষাদানের অধিকার শেষ ক'রেছে? ক্লান্তিতে তা'রা কি আজ আনত শির? —অক্ষয় ব্রতের অধিকার আমরা পেয়েছি। সে অধিকারের ভার আমাদের বহন করতে হচ্ছে,—শিক্ষাদানের অধিকারও আমাদের জন্য সত্য। নজরুল ইস্‌লাম লিখলেন:

"স্থবির শ্রান্ত প্রাচীর প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে গৌরব
অবনত-শির গতিহীন তারা—মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।"

পঞ্চম স্তবকে Whitman শক্তিমন্ত, নবতম ও বিচিত্রতর পৃথ্বী সৃজনের যে কথা ব'লেছেন, আবেগ-উজ্জ্বল সে ভাষণের অনুবাদ হয় না। "We debouch upon a newer, mightier world, varied world, fresh and strong the world we seize, world of labor and the march"—এর রূপান্তর ঘটেছে এভাবে:

"আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা অতীত,
গিরি গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান
চলমান বেগে প্রাণ উছল।"

ষষ্ঠ স্তবকে উন্নত-শীর্ষ পর্বত অতিক্রম ক'রে, অধিত্যকা উপত্যকা ও দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তর পশ্চাতে রেখে পদচিহ্নহীন অপরিচিত পথে বিজয়ের ও অধিকারের স্বাক্ষর রেখে যাবার কাহিনী পাই। অগ্রগামী সে পথিককে নজরুল ইস্‌লাম বলেছেন "অভিযান সেনা।"

দীর্ঘ ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক স্তবক "প্রতিচরণ" কখনো বা শব্দ পর্যন্ত ভাষান্তরিত হ'য়েছে। এতে অগৌরবের কিছু নেই : কিন্তু স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিলো। তবে একটা কথা স্পষ্ট যে, নজরুল ইস্‌লাম আপন মনের গতিপ্রবাহের সঙ্গে একান্ত তুলনীয় ভেবেছিলেন Whitman-এর মানবাত্মার স্পর্দ্ধিত নিঃশঙ্ক পদচারণ। তিনি তাঁর পদচিহ্ন ধরে যৌবনের অপ্রমেয় সাধনার তূর্যবাদক হ'তে চেয়েছেন। অনুকরণের এ-অভীপ্সার মধ্যে কবির দুর্দমনীয় জীবনাবেগের স্ফূর্তি রয়েছে। পশ্চিমের অনমনীয় যুবাশক্তির বন্দনা গান রচনা করেছেন আমেরিকার কবি,—আর আমাদের কবি—প্রাচ্যের অনিশ্চল তারুণ্যের মুক্তি-সঙ্গীত গেয়েছেন :

"আমরা এসেছি নবীন প্রাচীর নবস্রোতে
ভীম পর্বত ক্রকচ গিরির চূড়া হ'তে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার
আহত বাঘের পদ-চিন্‌ ধরি' হয়েছি বা'র ;
পাতাল ফুড়িয়া, পথ পাগল।
অগ্রবাহিনী পথিক-দল,
জোর্‌ কদম চল্‌রে চল্‌॥"

উপরের উদ্ধৃতিতে জীবনের যে-মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে—বস্তুর সম্পর্কে এসে যা' দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, মূল ইংরেজী কবিতায় কিন্তু তা'র পরিচয় নেই। Whitman যেখানে ব'লেছেন—"From the hunting trail we come", নজরুল ইস্‌লামের রচনায় সেখানে র'য়েছে "আহত বাঘের পদ-চিন্‌ ধরি হ'য়েছি বা'র।"

বাংলা উপমার মধ্যে জীবনের যে নিঃশঙ্ক পদক্ষেপের ইঙ্গিত পাই, ইংরেজীতে তা' নেই।

উভয় কবির কল্পনা, চিন্তার গতি, বাক্যসংযোজনা ও স্পন্দনের মধ্যে যেখানে অমিল দেখা যায়, সেখানে নজরুল ইস্‌লামের রচনার মধ্যেই উন্নততর কবি-মানসের পরিচয় মেলে। এর একমাত্র কারণ হ'ল এই যে, যেখানে নজরুলের বিপ্লবাত্মক ভাব-কল্পনার সঙ্গে হিন্দুদর্শন ও পুরাণের সংযোগ র'য়েছে, বিদেশী কবি সেখানে যন্ত্র-যুগের শক্তিমত্তার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজেছেন। যে-কাহিনী দীর্ঘদিনের ইতিহাস সৃজন করেনি, তা' কখনো ঐতিহাসিক চেতনার উৎস হ'তে পারে না। কলরবমুখর বর্তমানের বিশৃঙ্খলার সত্য-কাহিনী যদি লিখতে হয়, তবে আদিম যুগের প্রথম কোলাহলকে স্মরণে আন্‌তে হবে। Whitman-এর রচনায় একমাত্র বর্তমান সত্য র'য়েছে,—গভীর দিব্যানুভূতির অভাবে তাঁর তথ্যের' পরিবেশন সার্থক হয়নি। Whitman লিখেছেন :

"Raise the mighty mother mistress.
Waving high the delicate mistress over, all the
starry mistress,
(bend your heads all),
Raise the fang'd and warlike mistress, stern,
impassive, weapon'd mistress,
Pioneers ! O Pioneers !"

এখানে কাব্য নেই। জীবন-দর্শনের অভাবে গদ্যাত্মক বাচন-ভঙ্গিতে কবির রস-নিবেদন সার্থক হয়নি। অথচ নজরুল ইস্‌লাম হিন্দু পুরাণে ঐতিহ্যগত নির্ভরতার জন্যই যথার্থ কাব্য সৃজন কর্‌তে পেরেছেন :-

"তরুণ তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোল
করুণার নয়—ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল্।

নাগিণী-দশনা রণরঙ্গিণী শস্ত্রকর
তোর দেশ-মাতা, তাহারি পতাকা তুলিয়া ধর্।
রক্ত-পিয়াসী অচঞ্চল
নির্ম্মম ব্রত রে সেনাদল!
জোর্ কদম চল্‌রে চল্।"

পরিবর্তিত রূপে নজরুলের রচনায় উন্নততর কাব্য-সৃজনের আরো পরিচয় রয়েছে। Whitman যেখানে ঘূর্ণমান সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহ-তারার পরিভ্রমণ ও দিন-রাত্রির বিবর্তনের কথা বলেছেন, সেখানে নজরুল ইস্‌লাম স্বপ্নাতুর রাত্রির আচ্ছন্ন-প্রহরের কথা সংযোগ ক'রেছেন। একজনের তথ্যের রূপায়ণে কাব্যের নিবৃত্তি রয়েছে, অন্যের হাতে সেই তথ্য সত্যিকার কাব্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়েছে। Whitman নিছক কল্পনার ব্যাপকতায় স্বপ্নময় মায়াবী রাত্রির কথা ব'লেছেন কিন্তু নজরুলের কল্পনায় অনুভূতির স্পন্দন র'য়েছে, তাই "আলো ঝলমল দিবস" ও "স্বপ্নাতুর" রাত্রিই তাঁর কাহিনীর শেষ নয়—সেখানে "বন্ধুর মত ছেয়ে আছে সবে—নিকট-দূর।"

নজরুল ইস্‌লাম বিপ্লবাত্মক রচনার ক্ষেত্রে একই সুরকে সর্বব্যাপী অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। কখনো কখনো তাঁর স্বর কোমল স্তরে নেমে এসেছে। এ-কারণে তাঁর বিপ্লবের আবেদন দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়েছে—সর্বনাশের মধ্যেও আত্মগত গীতিপ্রবণ মনের কান্নার সুর শুনতে পেয়েছি। সকল বাধাকে উন্মূলিত ক'রে যে-পুরুষ নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হ'তে চাচ্ছে,—তা'র চলার পথেও অতর্কিতে কোমল-নয়নার মণি-মঞ্জীর বেজে উঠেছে। তাই বার বার বিদ্রোহীর দুর্ধর্ষ সঙ্কল্পের গতিবেগ শান্ত গীতোচ্ছ্বাসে প্রতিহত হ'য়েছে। যেখানে ছন্দ উদাত্ত-গভীর মূর্ছনায় গম্ভীর ভাব-কল্পনার উদ্গাতা হ'তে চেয়েছে, সেখানেই অলক্ষ্য থেকে বেদনার্ত আত্মার অভিযোগ শোনা গিয়েছে। সংশয়হীন চিত্ত-

স্ফূর্তি জীবনের মমতাময় আহ্বানে দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়েছে। নজরুলের কাব্যে মানবমনের প্রাণগত চাঞ্চল্যের সঙ্গে যুগের উৎকণ্ঠার সংযোগ ঘটেনি, তাই জীবন ও যুগের দ্বৈত-ধারার সমন্বয়ের প্রয়াস র'য়েছে মাত্র কিন্তু উভয়ের একাত্ম বিন্যাসে কল্পনার তটচিহ্ন-হীন সমুদ্র-পথে অগ্রগতি নেই। ধ্বংসের লেলিহান শিখা প্রজ্বলন্ত থাকেনি, আশ্বিনের শান্ত হাওয়ায় তা' নির্বাণ পেয়েছে।; যদিও :

"শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ
গমকে শিরায় গম গম!
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত পিশাচেরও
শির দাঁড়া করে চন চন!
যত ডাকিনী যোগিনী বিস্ময়াহতা,
নিশীথিনী ভয়ে থম্ থম্।"

তবুও কবি ভুলতে পারেননি :

"আজ আকাশ ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া
ঐ শেফালিকা তলে কে বালিকা চলে ?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া!"

: নজরুল ইস্লাম প্রলয় ও বিনাশকে কামনা করেছেন প্রধানতঃ তাদের বিপুল-প্রসারী বিশৃঙ্খলার জন্য। স্থির প্রাজ্ঞ বিশ্বাসকে আঘাত করে যে-সর্বনাশের লেলিহান শিখা পরিচিত দিগন্তকে নিশ্চিহ্ন করে দূরের আকাশে রাত্রির তারা হয়ে জ্বলে উঠে, সেই সর্বনাশকেই তিনি কামনা করেছেন। আমাদের মুহূর্তের গতি যে পৃথিবীতে একান্তভাবে অনিশ্চিত, সেখানে অস্থির-চিত্ত কবির পক্ষে স্বস্তি ও সম্ভ্রম দাবী করা চলে না। তিনি তাই কালবোশেখীর ঘূর্ণাবর্ত চেয়েছেন কিন্তু উদ্দাম প্রবাহের শেষে শান্ত ও স্নিগ্ধ সজল মৃত্তিকাকে গ্রহণ করেননি। যদিও তিনি বলেছেন ;

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন!

আস্‌ছে নবীন—জীবনহারা
অ-সুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় ব'য়েও আস্‌ছে হেসে—
মধুর হেসে !
ভেঙ্গে আবার গড়্‌তে জানে সে চির-সুন্দর ।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!"

তবে কি
মানুষ, প্রেমের
বোধের উৎস
হতে
পারে?

(কিন্তু এ উক্তি নিছক প্রবোধ-বাক্য মাত্র—ধ্বংস ও সর্বনাশকে আরও নিগূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ-এক সম্মোহনী ভাষণ।) বিষ্ণপতা অস্বস্তি এবং সর্বশেষে পরিপূর্ণ বিলয়ই কবির কাম্য। এদের মধ্যেই কবি স্থিতির আশ্বাস পেতে চেয়েছেন। তরঙ্গের উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সহজভাবে সংযুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তাই সত্য তাঁর পক্ষে একমাত্র, "মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে।" এ-কারণেই ধূমকেতুর ক্ষণকালের ঔজ্জ্বল্যই তাঁর কাছে সত্য ও প্রাণদ। অপঘাত, দুর্দৈব এবং অনাসৃষ্টিই নিরন্তর তাঁর কাছে মোহনীয়তা এনেছে। চিরকাল অনিয়মকে কামনা করেছেন বলেই তাঁর কোনো বক্তব্য নির্দিষ্ট হ'তে পারেনি—অসম্পূর্ণ কথার আচ্ছন্নতায় জীবনের সত্যিকার মূল্য অবজ্ঞাত হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন :

"আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত। তাই কোনা কথাই হয়তো গুছিয়ে বলতে পারব না। যার সারা জীবনটাই বয়ে গেল বিশৃঙ্খল আর অনিয়মের পূজা করে, তার লেখায় শৃঙ্খলা বা বাঁধন খুঁজতে যেয়ো না। হয়তো যেটা আরম্ভ করব সেইটেই শেষের, আর যেটায় শেষ করব সেইটেই আরম্ভের কথা।"

[রাজবন্দীর চিঠি—ব্যথার দান]

নজরুলের কবি-জীবন সম্পর্কে এর চেয়ে সত্য কথা আর নেই।

ইংরেজ কবি শেলী শক্তিমত্তার যে সুতীক্ষ্ণ আবেগ কামনা করেছেন, মুক্ত-জীবনের উন্মুক্ত আকাশ ও স্বচ্ছ মৃত্তিকাই তাঁর লালনভূমি। হতাশা ও হতোদ্যমের প্রশ্রয় সেখানে থাক্‌তে পারে না। যে-জাতির জীবনে আকাঙ্ক্ষা সীমা মানে না, নিরাবয়ব শূন্যও যেখানে দৃষ্টিসীমায় নীল হয়ে ভেসে উঠে, সেখানে জীবনের গতিতে মৃত্যু নেই। তাই কবি উন্মাদ আবর্তসঙ্কুল প্রবাহের মধ্যেও সৃষ্টির অঙ্কুর দেখেছেন :

"Make me thy lyre, even as the forest is :
What if my leaves are falling like its own !
The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep, autumnal tone,
Sweet though is sadness. Be thou, Spirit fierce,
My spirit ! Be thou me, impetuous one !
Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth
And by the incantation of this verse,
Scatter, as from an unextinguished heart
Ashes and sparks, my words among mankind !
Be through my lips to unawakened earth !
The trumpet of a prophecy ! O, wind,
If Winter comes, can spring be far behind ?"

[Ode to the West Wind]

নিচ্ছিদ্র ঘন-বিন্যস্ত বিশাল অরণ্যানী বাত্যার প্রবাহে সচকিত হ'য়ে সঙ্গীত-মুখর হয়, কবি সেই সঙ্গীতের উৎস হতে চেয়েছেন। বাত্যাবিক্ষুব্ধ প্রহর তাঁর মানসিক অস্থিরতার দোসর হ'য়েছে। নব-জীবনের উন্মেষকামনায় বেদনার্ত চিত্ত আনন্দে কল্লোলিত হয়েছে। অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড থেকে স্ফুলিঙ্গ যেভাবে চতুর্দিকে

বিক্ষিপ্ত হয়, কবির বাণীও সেইরূপ নবীন-জন্মের ভাষণ রূপে সমস্ত মানবমনে বিচ্ছুরিত হ'য়েছে। শীতের প্রহর বিশুষ্ক পত্র-পুঞ্জেই আচ্ছন্ন হয়নি, বসন্ত তার অনুগমন করেছে। তাই জীবন কোন মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন-বিলয় নয়, সে সর্বদাই নব-সৃষ্টির অঙ্কুরোদ্গমের অপেক্ষা রাখে।

জীবনের এই পরিপূর্ণ চিত্র নজরুল ইস্‌লামের কাছে আশা করাই ঔচিত্য-বিরোধী। তাঁর পরিচিত ক্ষেত্রের দিগন্ত আমাদের দৃষ্টির অত্যন্ত নিকটে, গ্লানি ও হতাশ্বাসই, এদেশের অনেকের মতো, তাঁরও গতিপথের সঞ্চয়। নীল আকাশ যেখানে মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয় নিমেষে, যেখানে সমস্ত স্বপ্ন ছায়ালোকের অবলুপ্তির অন্ধকারে মুছে যায়, যেখানে নিশীথের তারা মধ্যরাত্রিতেই নিভে আসে, সেখানকার জীবনে সৌষ্ঠব কামনা করা চলে না। নব-সৃষ্টির কল্পনাই সেখানে সম্ভব নয়। বাংলার কবির কাছে আমাদের কথা শুনেছি অনবরত, জীবনক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে নির্ভরতা সে কামনা করে, তাই সে যাচ্ঞা করে কিন্তু দাবী জানায় না।

কবি মোটেই
নিরাশাবাদী
ছিলেন না

তবুও বাংলার চিরাচরিত কাব্যধারায় নজরুল ইস্‌লাম কিছুটা ব্যতিক্রম। এর কারণ হ'ল, প্রথমতঃ, বাঙ্গালী-জীবনের সহজাত নীতিবোধকে তিনি শৈশব থেকেই অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন—উচ্ছৃঙ্খলতাকে ভূষণ করতে পেরেছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বহির্মুখী মন অতর্কিতে সুযোগ পেয়ে বাইরের পৃথিবীর ভাবধারা কিছুটা গ্রহণ করতে পেরেছিলো।

'ভাঙ্গার গান'

প্রত্যেক জাতির জীবনে এমন একটি সময় আসে, যখন সে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সাহিত্য কর্‌তে পারে না। যুগ এবং পরিবেশের কাম্য-বস্তুকে সে পরিবেশন ক'রতে চায়। কখনও এ-পরিবেশন প্রাত্যহিক জীবনের আবেষ্টনীর দ্বিধা অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর সত্যকে স্বীকার করে, আবার কখনও বা মূহূর্তের প্রাপ্য মিটিয়েই সে স্বস্তি পায়। অধিকাংশের পক্ষে এই স্বস্তি পাওয়াটাই স্বাভাবিক এবং নির্ধারিত। জীবনের উপজীব্য সেখানে অনাকাঙ্ক্ষ প্রহরের দাবী মেটানো, যেখানে মানুষ অধিকারের প্রশ্ন তোলে না, যেখানে মানুষের সমস্ত চিন্তার গতি শ্লথ মন্থরতায় স্বল্পায়ু জীবনের কামনা-বাসনার আবর্তে বিলীন হয়, সেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাহিত্য-সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু আশা করা চলে না।

নজরুলের "ভাঙ্গার গান" এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাব্য। দুর্দশা-গ্রস্ত জাতির জন্য এ-গান মুক্তির গান নয়—এ-গান শাসনক্ষেত্রে অধিকারীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভের গান। এখানে নতুন নির্দেশ নেই, জয়ের সঞ্চয় নেই, পুঞ্জিভূত হতাশ্বাসের প্রশ্রয় ও প্রকাশ রয়েছে ঃ

> "অন্ধকার! অন্ধকার!
> নিশ্বাস আজি বন্ধ মা'র
> অপমানে নির্মম লাজে,
> তাই দিকে দিকে ক্রন্দন বাজে,
> দীপ নেবাও! দীপ নেবাও!
> আপনার পানে ফিরিয়ে চাও
> ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
> ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,

সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও !”

জীবনক্ষেত্রে লাঞ্ছনা ও গ্লানি যখন কবিকে বিক্ষুব্ধ ক'রেছে, তখন প্রশান্ত জীবনের শাসন তিনি অস্বীকার করেছেন :

“নহি মোরা ভীরু সংসারী
বাঁধিনা আমরা ঘরবাড়ী !
দিয়াছি তোদের ঘরের সুখ,
আঘাতের তরে মোদের বুক।”

কিন্তু এ-বিক্ষোভ অতিরিক্ত হ'য়ে যখন মানুষের স্থির বিশ্বাস ও শালীন চিন্তাধারায় আঘাত করে, তখন কাব্যক্ষেত্রে তা মানসিক বৈকল্যের পরিচয় আনে। এক বিশেষ ইচ্ছার দ্বিধাহীন প্রকাশ, স্পষ্টভাষণ হ'তে পারে কিন্তু কাব্য হয় না। তবুও ক্ষণকালের জন্য তার মূল্য রয়েছে যথেষ্ট। “দুঃশাসনের রক্তপান” কবিতায় :

“ভয়ে ভীরু ওরে ধর্ম-বীর !
আমরা হিংস্র চাই রুধির !
শয়তান মোরা ? আচ্ছা তাই !
আমাদের পথে এসো না ভাই।
মোদের রক্ত-রুধির রথ,
মোদের জাহান্নামের পথ
ছেড়ে দাও ভাই জ্ঞান-প্রবীণ,
আমরা কাফের ধর্ম-হীন।”

এ-কয়টি চরণ কাব্যক্ষেত্রের কোনো গ্রহণীয় সঞ্চয় নয়। এখানে কবি আপনার লাঞ্ছিত মনের দুর্ভরতার সৌষ্ঠব বর্ণনা করেছেন কিন্তু কোনো নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আনেননি।—অথচ এই সম্ভাবনার ইঙ্গিতেই কবির সার্থকতা—যে-সার্থকতার পরিচয় পাই নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে :

"Yes, there must be a golden victory ;
There must be gods thrown down, and
trumpets blown
Of triumph calm ; and hymns of festival
Upon the gold clouds metropolitan,
Voices of soft proclaim, and silver stir
Of strings in hollow shells ; and there shall be
Beautiful things made new, for the surprise
Of the sky-children." (Keats)

মানব-মনের যে-পর্যায়ে বিনাশের ইতিহাসই একমাত্র সত্য, "ভাঙ্গার গান" তারই আবর্ত-সঙ্কুল কাহিনীর বিন্যাস।

'যুগবাণী'

সাহিত্য ও মানুষের জীবন যুগের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হ'তে পারে না, কিন্তু পূর্ণভাবে রাজনৈতিক আক্ষেপ ও উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভরশীল হ'লেও সাহিত্যের মূল্য থাকে না। যে রাজনৈতিক অনুভূতিতে সামাজিক চিন্তাধারা বিবর্তিত হচ্ছে এবং সে-সঙ্গে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের রূপ নির্ধারিত হচ্ছে—সে-অনুভূতিতে নিষিক্ত হয়েই সাহিত্যের আবেদন হয় গভীর এবং ইঙ্গিত হয় সর্বকালের জন্য। কিন্তু এই সর্বকালের আবেদনের কথাতেই যত অনর্থের সৃষ্টি হয়। আজ্‌কার সত্য আগামীকালের জন্যও সত্য থাক্‌বে কি?—এই নিরর্থক প্রশ্নের উত্থাপন ক'রে যাঁ'রা স্বপ্ন-প্রয়াণ করেন, তাঁ'রা সাহিত্যকে জানেন না। পৃথিবীর দিকে না তাকিয়ে ধ্যানলোকে পরমসত্যকে অনুধাবন করা চলে না। বাইরের আলোতেই অন্তর উদ্ভাসিত হবে এবং পৃথিবীর মাটির উপর পা রেখেই আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রবো। অবশ্য এ-সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখ্‌তে হবে যে, মানব-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো রাজনৈতিক আদর্শই সাহিত্যের উপাদান হ'তে পারে না, প্রচার-পত্রের কুক্ষিগত হ'য়েই তার মৃত্যু ঘটে। মিল্‌টনের Areopagitica আজও মিথ্যে হয়নি, তা'র কারণ যুগ যুগ ধ'রে লাঞ্ছিত ব্যক্তি-মানসের কাছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও উক্তি-স্বাধীনতার জন্য কবির মর্মস্পর্শী আবেদন চিরকালের জন্য সহৃদয়তার আস্বাদ এনেছে। কিন্তু তাঁর Reason of Church Government-এর অকাল মৃত্যুর জন্য আমাদের দুঃখ নেই।

নজরুল ইস্‌লামের "যুগবাণী"র আবেদন একটি বিশেষ সময়ের মানুষের প্রচলিত চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল ব'লেই কালোত্তীর্ণ

হ'তে পারেনি ; কিন্তু তবুও এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় অনাচার, সামাজিক কুসংস্কার এবং মানুষের বদ্ধমূল দাস্যবৃত্তির বিরুদ্ধে এমন কতগুলো কথা আছে যা' আজ্‌কের দিনেও অনিবার্য ভাবে সত্য।

বিদেশী আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের যুগে "যুগবাণী"র প্রবন্ধগুলো লিখিত। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমাদের দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশের বিশেষ ক'রে রুশের নবজাগরণের সংবাদ তারা শুনেছে, ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় তা'দের যথেষ্ট স্পষ্ট, উপরন্তু প্রত্যক্ষ-ভাবে গুরুতর বিপদের মধ্যে জড়িত থাকায় মাদকতাও আছে। এ-সব বিভিন্ন কারণে দেশব্যাপী এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত বিক্ষুব্ধতাতেই তা'রা সন্তুষ্ট ছিলো কিন্তু ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে তা'দের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়নি। এই বিক্ষোভে যাঁরা ভাষা, ছন্দ ও বাণী দিয়েছিলেন, নজরুল ইস্‌লাম তাঁদেরই একজন। তাঁর সঙ্গে সুর-সংযোজন ক'রেছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। এটা মনে ক'রলে কিন্তু ভুল করা হবে যে, সে-সময়কার কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনের মূল-তত্ত্বের প্রতি এঁদের কোন প্রকার মোহনীয়তা ছিলো না। নীতিহীন ও নির্দেশহীন বিপ্লব উচ্ছৃঙ্খলতার মাদকতাতেই নিমজ্জিত ছিলো, তাই এখানে-ওখানে অঘটন ঘট্‌লেও শোষকের জন্য কণামাত্রও সর্বনাশ এলো না। প্রত্যক্ষ উদ্দামতা মানুষের স্থিরবুদ্ধিকে নির্যাতন করেছিলো কিন্তু শুধুমাত্র ভাষায় ও ছন্দে আবেগময় উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্যা এনেছিলেন নজরুল ইস্‌লাম। সে-দিনকার বিপ্লবের মূল্য থাকেনি কিন্তু নজরুলের ভাষণ আহত ও নির্যাতিত মনের জন্য এখনও পরম অমোঘ।

সে-সময় সবাই একই সুরে কথা ব'লেছিল। একই আবেগ প্রত্যেকের মনকে দোলা দিয়েছিলো, তাই তাদের তথ্য ও ভাষা একই উচ্ছ্বাসে আবর্তিত হ'য়েছিলো। সকলের সঙ্গে সুর-সঙ্গতির জন্যই খ্যাতিলাভে নজরুল ইস্‌লামের বিলম্ব ঘটেনি, কিন্তু আকস্মিক

উচ্ছ্বাস সহজেই স্তিমিত হ'য়ে প'ড়লো। যে-ভাষায় নজরুল ইস্‌লাম কথা ব'লেছিলেন—সে ঐ যুগেরই বিশিষ্ট ভাষা। একই ভাষায় কথা ব'লেছিলেন একই আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, মুজ্জাফ্‌ফর আহ্‌মদ ও আরও অনেকে। তখনকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকগুলোও একই সুরে কণ্ঠ মিলিয়েছিলো।

"সৎ-সঙ্গী"র প্রথম সংখ্যায় (১৩২৭ সাল) বারীন্দ্রকুমার বাংলার সাধনার কথা বল্‌তে গিয়ে লিখ্‌লেন :

"আজ আবার অসাধ্য সাধনের যুগ এল, কালের অপার থৈ থৈ নীল জলে এ-জগতের কমলে-কামিনী জীবনের পবনে আবার বুঝি জগৎ জুড়িয়ে তুল্‌বে! উষার আকাশ মুখর ক'রে, মলয় বাতাস পাবন ক'রে এ-জাতির মায়া-মোহ সকল হ'রে নিয়ে সে-বারতা প্রাণের কূলে পৌঁছে গেছে। ওরে সাত শ' বছরের মরা, তোদের এবার বুঝি নতুন ক'রে বাঁচবার পালা। এমনতর ক'রে যথাসর্বস্ব খুইয়ে, ম'রে বুঝি তোমরা জন্মের শোধ অমৃত-ধনের পরম অধিকারী হ'তে চল্লে।

"মরণমন্ত্রই শিখেছিলে যদি, তবে এবার নিবিড় মরণও ম'রে দেখ; সবদিকে কি ক'রে বেঁচে যেতে হয়, ওগো জীবের বিনাশে কি ক'রে প্রতি ঘট ভ'রে তড়িদুজ্জ্বলা শিবশক্তির উদয়, তাই এবার জগৎকে দেখাও। সমর্পণ-যোগের যোগী আত্মশক্তির এই রত্নাকর জলে ডুব দে, দেখ পাতাল কত দূর। যা' করা যায় তা'তো সবাই ক'রে! যা' মানুষে পারে না, এবার যে তোমাদের সেই খেলা খেলতে হবে,—পাষাণ ভ'রে জীবনের ফুল ফুটাতে হবে।………

"এক দেহ, এক প্রাণ; এক মধুময় সত্যের দৃঢ় বন্ধন; তা'র মাঝে মুক্তির লহরে অনায়াসে অক্লান্ত কর্ম। কামনা নাই, আছে প্রেরণা; মানুষ নাই, আছে বিরাট; বামন হ'য়েও ত্রিলোক জোড়া। এবার মানুষের জগৎপ্লাবনকারী সাগরমুখী-গঙ্গা তোমরা

বহিয়ে আন। বাঙ্গালার ভাগীরথী এবারে ত্যাগের গৈরিক দ্রব ও ভোগের তরঙ্গমঞ্জুল তরল অমৃত জলে ভারত ডুবিয়ে বুঝি আট্‌লান্টিক প্যাসিফিক উপকূলেও ঢেউ দেবে।”

মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখ্‌লেন “মোস্‌লেম ভারত”-এ (আশ্বিন ১৩২৭):

“গাছের পাতা এতটুকুও নড়িতেছে না। সমস্ত আকাশ ঘোর কালো মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; এখনি নামিবে বিশ্ব-বিধ্বংসী ঝড় আর বৃষ্টি। মাঝি বসিয়া ভাবিতেছে—এ-উত্তাল সমুদ্রে তরীর পাড়ি দিই কি না দিই। কেন পাড়ি দিবে না, মাঝি? তোমার যে পাড়ি দেওয়াই কাজ। ঝড়-বৃষ্টি, দুর্যোগকে আর-যে ভয় করে করুক, মাঝি তুমি, তোমার ভয় করিলে চলিবে কেন?…

“সত্য বটে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে এই কালো সমুদ্র বড় ভয়ঙ্কর, বড় ভীষণ; সত্য বটে, সমুদ্রের ঢেউ বড় প্রচণ্ড, বড় শক্তিশালী, কিন্তু তাই বলিয়া সমুদ্র কি কেহ পার হয় না ভাই? কোথায় ছিল আমেরিকা কোন্ অজানার রাজ্যে, মানুষ কি উহাকে আবিষ্কার করে নাই ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া? তরঙ্গের প্রচণ্ডতা ও শক্তিমত্তাকে দলিত করিয়া জাহাজ কি চলে না ভাই সমুদ্রে? আমরা কর্তব্যের আহ্বান শুনিয়াছি; সব বাধা, সব বিঘ্নকে আমরা উপেক্ষা করিয়া চলিব। দুর্যোগের ভিতর চলিয়া চলিয়া আমাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, দুর্যোগকে আমরা আর ভয় করি না! ঝড়-বৃষ্টি নামিয়া আসে আসুক, চল্ মাঝি ভাই, আমরা দুর্যোগের পাড়ি দিই, দে ভাই, তরীর বাঁধন মুক্ত করিয়া। ঐ শোন্ কবি গাহিতেছে:

‘আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধ্‌বে?’

“প্রবর্তক” পত্রিকায় লেখা হ’লো:

“বিশ্বস্রষ্টার অসীম করুণায় অনন্ত প্রেরণাপুঞ্জ মাথার উপরে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে—উহাকে স্বতঃপ্রকাশ করিতে হইবে—

হে বাংলার নরনারি! আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তোল, সিদ্ধি তো আজ একজনের জন্য নয়, একজনের সার্থকতা সহস্রজনকে গিয়া পরিপ্লুত করিবে, সহস্রজনের সিদ্ধশক্তি কল কল বিপুল তরঙ্গে সকলকে ভরাইয়া তুলিবে—চিন্তাকে গভীর, হৃদয়কে অসীম প্রসারিত করিয়া দাও, দিগন্তবিস্তৃত হৃদয়সমুদ্রের উপর চিত্র-বিচিত্র অপূর্ব জীবন কৌশল ক্রীড়া করুক—বাক্ শ্রান্ত, লেখনী আমার চলিয়া চলিয়া ঢলিয়া পড়িল—বাঙ্গালী আমার মর্মকথা কি অন্তর দিয়া বুঝিবে না?" ……ইত্যাদি।

এ-সমস্ত কথাই একই সূত্রে গাঁথা। ভাষা, ভাষণ ও তথ্য সমগ্রভাবে একই সংবাদ পরিবেশন করছে! সমুদ্রতরঙ্গের ফেনপুঞ্জের মতো সে-যুগের উচ্ছ্বাস ক্ষণকালের জন্য উচ্ছ্বসিত হয়েই চিরকালের জন্য নির্বাপিত রইলো। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই উচ্ছ্বাস একটি পর্যায় সৃষ্টি ক'রেছিলো এবং ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা সে-কথা স্মরণ করবো। কিন্তু সাহিত্যের অক্ষয় আনন্দের ভোজে সে-সব কথার কয়টি পঙ্‌ক্তি দেদীপ্যমান থাকবে তা' নিশ্চিন্তে বলা যায় না। নজরুল ইস্‌লাম এই ক্ষণ-উজ্জ্বল অগ্নিশিখা নিয়েই মেতে উঠেছিলেন, বৈশ্বানরের বিশ্ব-বিধ্বংসী লীলায় উন্মাদ-করতালি দিয়ে উঠেছিলেন—তরুণ সম্প্রদায় যুক্তিতাপিত চিন্তার তিরোধানে উল্লসিত হয়েছিল কিন্তু এ-ভাবে অক্ষয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়নি। তবুও নজরুল ইস্‌লাম আমাদের স্মরণীয়—তাঁর অন্যায়ের প্রতি দৃপ্ত বিরুদ্ধাচরণের জন্য। এই বিরুদ্ধাচরণের পরিচয় "যুগবাণী"তে আছে।

তৎকালীন "নবযুগ"-এর সম্পাদকীয়-স্তম্ভে লিখিত প্রবন্ধগুলো গ্রথিত করে "যুগবাণী"কে সাজানো হ'য়েছে। কতগুলো রচনা অত্যন্ত বেশী সাময়িক, যেমন "লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য", "মুহাজেরিণ হত্যার জন্য দায়ী কে?" "শ্যাম রাখি না কুল রাখি", "লাট-প্রেমিক আলী ইমাম," "জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়”, “ছুঁৎমার্গ”, “গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ”, কিন্তু এ-গুলো ছাড়া আরও কতগুলো লেখা আছে—যেগুলোর সত্যতা আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতেও মুছে যায়নি। “ধর্মঘট” রচনাটি আজকের দিনেও নিষ্ঠুরভাবে সত্য। অন্যের অধিকৃত জমিকে সুশ্যামল কর্‌বার জন্য যতদিন পর্যন্ত শ্রমজীবীর প্রয়োজন থাক্‌বে, ততদিন পর্যন্ত শোষণের ইতিহাসও মিথ্যে হবে না আর এমনি করেই নিষ্পেষণের গতি পূর্বতন খাতেই বয়ে চল্‌বে। স্বাধীনতা কোথাও কোথাও উজ্জ্বলতা এনেছে কিন্তু সর্বত্র আশ্বাস আনেনি। যেখানে আশ্বাস নেই সেখানে তিরিশ বছরের আগেকার অন্ধকার আজও তিমিরাঞ্চল বিছিয়ে রেখেছে।

নজরুল ইস্‌লামের ছন্দ

ছন্দকে অনুসরণ ক'রে বক্তব্য কখনও রূপ পায় না। আদর্শ কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা ছন্দকে পাই বক্তব্যের পরিপোষক ও অনুসঙ্গী হিসাবে। বক্তব্যের গতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে কাব্যের বহিরাবরণের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক র'য়েছে। যে দিব্যানুভূতি ও হৃদয়ের অশেষ প্রত্যাশা থেকে কাব্যের উদ্ভব, প্রকাশভঙ্গীতে শব্দের সঙ্গীতেই তা'র রূপ ধরা প'ড়বে। প্রত্যেক শব্দের নিজস্ব একটা সঙ্গীত আছে আবার একটা বাক্যের মধ্যে তা'র স্থান সুনির্দিষ্ট হ'লে পূর্বাপর অন্যান্য শব্দের সমন্বয়ে তা'র মধ্যে কিছু গভীরতর আবেদনের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণে সুরের যে আবর্ত সৃষ্টি হয়, কোনো বিশেষ ছন্দের পরিধিতে সেই আবর্ত নতুন সম্ভাবনায় জেগে উঠে। এই সম্ভাবনাই কবিতার ভাষাকে গদ্যের ভাষা থেকে বিছিন্ন করেছে। যিনি সত্যিকারের কবি, তিনি শব্দ-প্রয়োগের এই সূক্ষ্ম রীতি সম্পর্কে অবহিত হবেন। শব্দ তাঁর মধ্যে দূরাগত সঙ্গীতের মতো একটা মোহনীয়তা সৃষ্টি করবে ভাবৈশ্বর্যের অকৃত্রিম বাহক হিসাবে, কিন্তু শব্দের সৌন্দর্য তাঁকে আবিষ্ট করবে না। যেখানে শব্দের সৌন্দর্যই মুখ্য, সেখানে বর্ণনার চাতুর্য থাকে কিন্তু ভাবের তন্ময়তা থাকে না। অথচ ভাবের তন্ময়তা ব্যতিরেকে জীবনের সত্য নির্দ্ধারণ সম্ভবপর নয়। নিম্নে একটা ইংরেজী কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। এখানে শব্দের গতি আছে কিন্তু বিভিন্ন শব্দের সমন্বয়ে কোনো বিশেষ অর্থের সৃষ্টি হয়নি :

শব্দসর্বস্ব
[illegible]
থেকে
শ্রেষ্ঠতা

"Keeping time, time, time.
In a sort of Runic rhyme,

To the tintinnabulation that so musically wells
From the bells, bells, bells, bells.
Bells, bells, bells.
From the jingling and the tinkling of the bells."

[E.A.Poe.]

উপরের উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, এখানে শব্দগত অনুপ্রাসের জন্য একটি ক্লান্তিদায়ক গতির সৃষ্টি হয়েছে। তার অতিরিক্ত এখানে কিছু নেই। ভাবকে অনুসরণ ক'রে ছন্দের পরিধি গঠিত হয়নি—কবি এখানে বিভিন্ন শব্দের পুনরাবর্তনের মধ্যবর্তিতায় ঘণ্টার অনুরণনের একটি ক্লান্তিদায়ক গতি সৃজন ক'রতে চেয়েছেন। তাই এখানে বর্ণনা-চাতুর্য স্পষ্ট হ'য়েছে—কিন্তু পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালের কাহিনী জীবন্ত হয়নি। এ-সঙ্গে শেলীর একটি কবিতার অংশবিশেষের তুলনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, কবিতার রস-রূপের সঙ্গে ছন্দের সংযোগ ঘটেছে এবং ভাবানুগত ছন্দ এক বিচিত্র সীমার রুদ্ধদ্বার উন্মোচন ক'রেছে :

"From the forests and highlands,
We come, we come ;
From the river-girt islands
Where loud waves are dumb
Listening to my sweet pipings.
The wind in the reeds and the rushes,
The bees on the bells of thyme,
The birds on the myrtle bushes,
The cicale above the lime,
And the lizards below in the grass,
Were as silent as ever old Tmolus was
Listening to my sweet pipings."

[P. B. Shelley]

কবির মূল উদ্দেশ্য বস্তুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অথবা বস্তুর দৃশ্যমান সৌন্দর্যের রেখাঙ্কন নয়—তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মানসলোকে সেই বস্তুর আবেশ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ সেই বস্তুকেই মানসলোকের অগম্য প্রান্তে প্রাণময় করা। এড্‌গার এলান পো'র কবিতায় এটা সম্ভবপর হয়নি, কেননা তাঁর শব্দে ও শব্দগত অনুপ্রাসে বস্তুর বিবরণ রূপ পেয়েছে—জীবনের সত্য বিধৃত হয়নি। শেলীর কবিতায় কবির সূক্ষ্ম জীবন-বোধ ছন্দে ও শব্দের বিচিত্র সজ্জায় রূপ লাভ ক'রেছে। সেক্‌স্‌পীয়রের একটি সনেটে আছে :

"That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin'd choirs where late the sweet birds sang."
[Shakespeare]

মহাকবি আপন মনের প্রতিচ্ছায়া দেখেছেন শীতের পত্র-পল্লব-চ্যুত বিশুষ্ক বৃক্ষের মধ্যে। বিভিন্ন শব্দের সমন্বয়ে কবির মনোলোকের ইতিহাস সৃজিত হ'য়েছে। বাঞ্ছিতার আশায় বিরহ-কাতর নিঃসঙ্গ কবি বিশুষ্ক বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছেন। আমাদের মানস-দর্পণে সেই বৃক্ষের ছায়াই শুধু জেগে উঠে না, প্রখর পৌষের নিষ্ঠুরতায় নির্জীব বিশীর্ণ তরুর সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ ঘটে। তা'র দুর্দশার মধ্যে আমরাও জেগে উঠি। সনেটের নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে গভীর আবেগ সংযত শোভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

আমরা এখানে বিশ্লেষণ করে জান্‌তে চেষ্টা কর্‌বো যে, নজরুল ইস্‌লামের ছন্দ তাঁর ভাবাবেগকে কতটা অনুসরণ করতে সক্ষম হ'য়েছে এবং তাঁর ছন্দের বিশিষ্টতাই বা কোথায়। কিন্তু তাঁর আগে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় শব্দাংশের উচ্চারণের পরিমাণের উপর নির্ভর ক'রে ছন্দ গঠিত হ'ত। একে ইংরেজীতে বলা হয় quantitative metre বা পরিমাণ-নির্ভর ছন্দ। সংস্কৃত ছন্দও একই প্রকারের। এই পরিমাণ-নির্ভর ছন্দ স্বরবর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল ব'লে, এই ছন্দে তরল আবেগ, শান্ত সমাহিত চিত্তের আবেদন ও ক্লান্তিময় আবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিশেষ ক'রে সংস্কৃত কাব্যে তাই হ'য়েছে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সংস্কৃতে ছন্দের এই রূপ ভাষার গতির স্বাভাবিকতার অনুসঙ্গী ব'লে তা' গ্রহণ ক'রতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বাংলাতে এই ছন্দই অস্বাভাবিক ক্লান্তির সৃষ্টি করে এবং ধ্বনির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ছন্দপতন ঘটতে পারে। ব্রজবুলীতে সম্পূর্ণভাবে লঘুগুরু ধ্বনি অনুসৃত না হ'লেও স্থানবিশেষে স্বরবর্ণের ধ্বনি বিলম্বিত করতে হয়। উপমাস্বরূপ বিদ্যাপতির একটি অত্যন্ত পরিচিত পদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রছি :

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥"

কবিতাটি ২৬ মাত্রার ত্রিপদী (৮+৮+১০)। এখানে কয়েকটি স্বর বিলম্বিত লয়ের। প্রথম পূর্ণ চরণের 'চতুরানন'-এর 'রা', 'যাওত'-এর 'যা' এবং 'অবসানা'র 'সা' বিলম্বিত লয়ের। তিনটি ক্ষেত্রেই 'আ' স্বরের গুরুত্ব সম্পাদিত হ'য়েছে। পরবর্তী চরণের 'তোহে'র 'তো' 'সমাওত'র 'মা' 'সমানা'র 'সা' বিলম্বিত লয়ের। এভাবে ইচ্ছানুসারে স্থানবিশেষে স্বরবর্ণের ধ্বনি বিলম্বিত লয়ের হওয়ায় বিহ্বল তদ্‌গত চিত্তের আত্মনিবেদনের সুর সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা ছন্দের সর্বপ্রথম বৃহৎ পরিবর্তন সাধন করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সুবিপুল কল্পনা ও দ্বিধাহীন আকাঙ্ক্ষার গতি পরিচিত পয়ারের শ্রান্ত বিন্যাসের মধ্যে ক্রমশঃ নির্বাপিত হ'তে পারে এই ধারণায় তিনি বাংলায় মুক্ত ছন্দের প্রথম প্রবর্তন করেন। ইংরেজী ছন্দের শব্দাংশের ঝোঁককে বাংলায় আমদানি ক'রে বাংলা পয়ারকে বিপুল ভাব-গাম্ভীর্যের বাহক করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হ'য়েছিলো। মাইকেলের আশ্চর্য কুশলতায় ইংরেজী সিলেবলের ঝোঁক বা stress অমিত্রাক্ষরের শব্দবিন্যাসের মধ্যে সহজে প্রকাশ পায়। এটা সম্ভবপর হ'য়েছিলো দু'টি কারণে। প্রথমতঃ অক্ষরগত ও ঝংকারগত অনুপ্রাসের জন্য, দ্বিতীয়তঃ ব্যঞ্জনবর্ণ ও সংযুক্তস্বরের আধিক্যের জন্য।

১। অক্ষরগত ও ঝংকারগত অনুপ্রাসের নিদর্শন :

(ক) সুন্দ´ উপসুন্দ´াসুর, সু´রে পরাভবি,
লণ্ড´ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ড´ল ;
[তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য]

(খ) মৃদুহাসি শশী´সহ নিশি´ দিলা দেখা
[ঐ]

(গ) শো´ভিল, শি´শির যেন শ´তদল-দলে,
[ঐ]

(ঘ) আইলা সু´চারু-তারা শ´শী সহ হাসি´,
শ´র্বরী ; সু´গন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সু´স্বরে স´বার কাছে কহিয়া বিলাসী´,
[মেঘনাদবধ কাব্য]

(ঙ) বন্দী´ সম শিলাবন্ধে´ বান্ধি´য়া সিন্ধু´রে
হে সু´ন্দরী, প্রভু মম রবি-কুল-রবি,
[ঐ]

(চ) অর´াম করিবে ভব তুর´ন্ত র´াবণি
[ঐ]

(ছ) স´ শঙ্ক লঙ্কেশ´ শূর স্ম´রিলা শ´ঙ্করে
[ঐ]

উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, অনুপ্রাসের জন্য শব্দের প্রত্যেক উচ্চারিত অংশে একটা আশ্চর্য ঝোঁকের সৃষ্টি হ'য়েছে এবং সেই ঝোঁক প্রত্যেক যতি ও পদভাগকে নিয়ন্ত্রিত ও আবর্তিত করছে। অনুপ্রাসের লালিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠক পূর্বেই পরিচিত ছিলো, কিন্তু অনুপ্রাসগত ঝোঁক ও তদ্‌জনিত সম্পূর্ণ পদভাগে একটা আশ্চর্য হিল্লোল মাইকেলের সৃষ্টি।

ইংলণ্ডের প্রাথমিক যুগের কাব্যে অনুপ্রাসগত ঝংকার ও ঝোঁক ছন্দের একমাত্র প্রাণ ছিলো। কয়েকটি নির্দিষ্ট ঝোঁকের উপর একটি চরণের ছন্দ নির্ভরশীল ছিলো। এখানে Piers Plowman কাব্যের প্রারম্ভিক কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি :

"In a su'mmer se'ason, when so'ft was the su'n,
I sho'pe me into shro'uds, as I a she'pherd we're,
In ha'bit as an' her'mit, unho'ly of wo'rks,
Went wi'de in this wo'rld, wo'nders to hea'r."

[Piers Plowman]

অনুপ্রাসের ঝোঁকে নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক যুগের ছন্দ পরবর্তী যুগের শব্দাংশগত ঝোঁকের নিয়মিত মাত্রায় পরিণত হয়। বাংলায় কিন্তু এই বিবর্তন সম্ভবপর হয়নি, কেননা মাইকেলের দীপ্ত আবেগ বিহারীলালের আত্মগত অনুপ্রেরণায় প্রশমিত হ'য়ে সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের মন্ময় অনুভূতিতে নির্বাণ লাভ করে। মাইকেলের শব্দাংশগত ঝোঁক, রবীন্দ্রনাথে বাক্যাংশগত ঝোঁকে পরিণত হয়।

নজরুল ইস্‌লাম ইংরেজীর stress rhythm বা শব্দাংশগত ঝোঁককে বাংলায় আবার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। আমরা তা' নিয়ে পরে আলোচনা কর্‌বো।

২। ব্যঞ্জনবর্ণ ও সংযুক্ত-স্বরের আধিক্যের নিদর্শন :

(ক) সুকিঙ্ক' রীবৃন্দ' যথা নরেন্দ্র' সমীপে
[তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]

(খ) মৃগা' ক্ষী, পীবরস্ত' নী, সুবি' ম্ব-অধরা
[ঐ]

(গ) দুকূল' কাঁচলি', সিঁতি, কঙ্ক' ণ কিঙ্কি' নী,
কুন্ত' ল, মুকুতাহার, কা' ঞ্চী কটিদেশে
[বীরাঙ্গনা কাব্য]

(ঘ) বেড়িল গন্ধ' র্ব নর শত প্রস' রণে
রক্ষে' ন্দ্রে ; হুঙ্ক' ারি শূর নির' স্তিলা সবে
নিমে' ষে, কাল' াগ্নি যথা ভস্মে' বনরাজী।
[মেঘনাদবধ কাব্য]

(ঙ) উদিলা আদি'ত্য এবে উদ'য় অচলে,
পদ্ম'প'র্ণে সু'প্ত দেব পদ্ম'যোনি যেন,
উন্মী'লি নয়নপদ্ম' সুপ্র'সন্ন'-ভাবে
চাহিলা মহীর পানে! উল্ল'াসে হাসিলা
কুসুম কুন্ত'লা মহী, মুক্ত'ামালা গলে।
[ঐ]

(চ) দেখিলা সম্মু'খে
রাঘবেন্দ্র' বিভা-রাশি নি'ধু'ম আকাশে
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে'।
[ঐ]

(ছ) কেহ টঙ্ক'ারিলা
শিঞ্জি'নী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গি'লা অসি ;
আস্ফ'ালি'লা শূলে কেহ ॥ [ঐ]

উপরের উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে দেখ্তে পাচ্ছি যে ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্তস্বরের আধিক্যবশতঃ প্রত্যেক পদভাগে ও পূর্ণ-যতির বৃত্তের মধ্যে শব্দাংশগত ঝোঁক ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত ক'রছে—এবং ভাব-গাম্ভীর্যের স্বাভাবিক বাহক হ'য়েছে। প্রাচীন Anglo-Saxon কবিতায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত-স্বরের অত্যধিক প্রয়োগ দেখা যায়। উপমাস্বরূপ কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি ঃ

(ক) Oft Scyld Scefing Sceathena threatum
(খ) Aledon tha leofne theoden
(গ) Heofona hlaford hyldon me no dorste
(ঘ) Ne swete forswelgan ne sar gefelan

অন্ধকার থেকে আলোকে বিনির্গমনের সাধনা ক'রেছিলেন Anglo-Saxon কবিগণ। কিন্তু সে সাধনা সমাহিত চিত্তের সাধনা ছিলো না—তা' ছিলো দুর্ধর্ষ অশেষ শক্তিধরের জয়লাভের প্রয়াস। তাঁদের ভাষাও দুর্ধর্ষ ভাব-কল্পনাকে অনুসরণ ক'রেছে, তাই সেখানে ব্যঞ্জনবর্ণের এত আধিক্য দেখি।

নজরুল ইস্লাম ব্যঞ্জনবর্ণের দ্রুত লয়ের ঝঙ্কার ও গম্ভীর ধ্বনি-মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বাংলা ছন্দের সনাতন রূপকে অব্যাহত রেখেও শব্দাংশের ঝোঁক দিয়ে পর্ব, পদ ও বাক্যাংশের গতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে চেয়েছেন।

নজরুল ইস্লামের প্রতিভার ভাবগত ও ছন্দগত সৌন্দর্যের প্রথম উন্মেষ ঘটে "বিদ্রোহী" কবিতার মধ্যে। যদিও "বিদ্রোহী"র অনেক চরণে দুর্বল শব্দবিন্যাস ও অর্থহীন চাতুর্যের পরিচয় মেলে কিন্তু তবুও ছন্দের নতুনত্ব ও কোথাও কোথাও অন্তরাবেগের সুতীব্র স্ফূর্তির জন্য এই কবিতাটিই নজরুল প্রতিভার পথনির্দেশক হ'য়ে আছে। কবিতাটির আরম্ভে আছে ঃ

"বল বী'র—
বল উন্ন'ত মম শি'র

শির নেহারি আ´মারি, নত-শির ও’ই শিখর হিমাদ্রি’র !
বল বী’র—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি’
চন্দ্র’ সূ’র্য গ্রহ তারা ছা’ড়ি
ভূলোক দ্যু’লোক গোলোক ভে’দিয়া,
খোদার আসন ‘আরশ’ ছে’দিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ম´য় আমি
বিশ্ব-বিধাত্রী´র !
মম ললাটে রু´দ্র ভগব´ান জ্ব’লে রাজ-রা´ জটীকা দী´প্ত জয়শ্রী´র !”

ভালো ক’রে লক্ষ্য ক’র্‌লেই আমরা দেখ্‌তে পাব যে, ‘বীর,’ ‘শির’, ‘হিমাদ্রির’, ‘বিধাত্রীর’ ও ‘জয়শ্রীর’ প্রত্যেক শব্দের মধ্যবর্তী ‘ই’ অথবা ‘ঈ’ স্বর বিলম্বিত লয়ের হওয়া সত্ত্বেও, শব্দান্তের ‘অ’ স্বর অনুচ্চারিত থাকায় প্রত্যেক শব্দে একটি ঝোঁকের সৃষ্টি হ’য়েছে। এ-ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত-স্বরে বিচ্ছিন্নভাবে stress আপতিত হওয়ায় বিভিন্ন পদ-মধ্যে গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হ’য়েছে।

উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে আর একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার আছে। মূলতঃ সম্পূর্ণ স্তবকটিতে মহাপ্রাণ উষ্মবর্ণ ‘শ’ এবং একই সঙ্গে অল্পপ্রাণ অন্তঃস্থ বর্ণ ‘র’-এর অনুপ্রাসজনিত আবর্তের সৃষ্টি হ’য়েছে। এ-ছাড়া অন্যান্য বর্ণেরও অনুপ্রাস সৃষ্টি হ’য়েছে, কিন্তু তা’দের গুরুত্ব এখানে ততটা নেই। কবি এখানে আশ্চর্যভাবে একদিকে মহাপ্রাণ উষ্মবর্ণের ও অন্যদিকে অল্পপ্রাণ অন্তঃস্থবর্ণের অনুপ্রাসজনিত ঝোঁকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা ক’রেছেন। এভাবে ভাবসম্পদের গুরুত্ব অনুসারে বিশেষ পরিধির মধ্যে একটি পরিমিত গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হ’য়েছে।

এই কবিতায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত-স্বরের অত্যধিক প্রয়োগের কয়েকটি নিদর্শন দিচ্ছি। দেখ্‌তে পাবো যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইংরেজী stress-এর মতো ঝোঁকের সৃষ্টি হ’য়েছে :

(ক) আমি চিরদু'র্দম দুর্বিণী'ত, নৃশং'স
মহা-প্রলয়ের আমি নটরা'জ, আমি সাইক্লো'ন, আমি ধ্বংস

(খ) আমি চির-দুরন্ত' দু'র্মদ,
আমি দুর্দ'ম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দ'ম হ্যায়, হর্দ'ম ভরপু'র মদ।

(গ) আমি বজ্র', আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্ক'ার,
আমি ইস্র'াফিলের শিঙ্গ'ার মহা-হুঙ্ক'ার

(ঘ) আমি উজ্জ্ব'ল, আমি প্রজ্ব'ল,
আমি উচ্ছ'ল জল-ছল-ছল', চল-ঊর্মির হিন্দো'ল্-দোল্।

(ঙ) আমি ত্রাস সঞ্চ'ারি ভুবনে সহসা সঞ্চ'ারি ভূমিকম্প'

(চ) আমি প্রভঞ্জ'নের উচ্ছ্ব'াস, আমি বারিধির মহাকল্লো'ল

এই ঝোঁকের জন্য প্রত্যেক বিরতি পর্যন্ত পদভাগের মধ্যে একটা ছন্দ-স্পন্দ সৃষ্টি হ'য়েছে এবং এই ছন্দ-স্পন্দ প্রতি চরণের মাত্রাবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত ক'রছে। ইংরেজীতে যেখানে ঝোঁকের পরিমাণ গণণা ক'রে মাত্রা নির্দ্ধারণ করা হয়, বাংলাতে সেখানে ছন্দের স্পন্দন অনুসরণ ক'রে মাত্রা নির্ধারিত হয়। নজরুল ইস্‌লাম শব্দাংশগত ঝোঁকের সহায়তায় এই ছন্দ-স্পন্দ সৃজন ক'রেছেন। তিনি বাংলা ছন্দের পরিধির মধ্যে ইংরেজী ছন্দের বৈচিত্র্য এনেছেন।

অক্ষরবৃত্তের যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন পদভাগের প্রাথমিক মাত্রায় একটা Phrasal accent বা বাক্যাংশগত বাক্ময় ঝোঁক সৃষ্টি ক'রে বাংলা ছন্দের চিরাচরিত ক্লান্ত গতিতে নজরুল ইস্‌লাম প্রাণসঞ্চার করেন। "পূজারিণী" ও "সিন্ধু" কবিতায় ছন্দের এই নতুন প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা পাই। তা' নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রবার পূর্বে "বিদ্রোহী" কবিতার পর্ববিভাগ সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

"বিদ্রোহী" কবিতাটি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পর্বভাগে ঢালাই করা, কিন্তু ইংরেজীর মতো শব্দাংশগত ঝোঁকের আধিক্যবশতঃ সমপরিমাণের মাত্রায় পর্বগুলো বিন্যস্ত হয়নি। কিছুটা উদ্ধৃত কর্‌ছি ঃ

আমি | চির-দুরন্ত | দুর্মদ (২) .৬ (৪)
আমি | দুর্দম, মম | প্রাণের পেয়ালা | হর্দম, হ্যায় |
হর্দম ভর্‌ | পূর্‌ মদ (২).৬.৬.৬.৬.(৪)
আমি | হোম-শিখা, আমি | সাগ্নিক জম | দগ্নি, (২).৬.৬.(৩)
আমি | যজ্ঞ, আমি | পুরোহিত, আমি | অগ্নি (২).৫.৬.(৩)
আমি | সৃষ্টি, আমি | ধ্বংস আমি | লোকালয়, আমি | শ্মশান,
(২)৫.৫.৬.(৩)
আমি | অবসান, নিশা | বসান ! (২).৬.(৩)
আমি | ইন্দ্রাণি সুত | হাতে চাঁদ ভালে | সূর্য, (২).৬.৬.(৩)
মম | এক হাতে বাঁকা | বাঁশের বাঁশরী, | আর হাতে রণ | তূর্য !
(২).৬.৬.৬.(৩)
আমি | কৃষ্ণ-কণ্ঠ, | মন্থন-বিষ | পিয়া ব্যথা-বারি | ধির !
(২).৬.৬.৬.(২)
আমি | ব্যোমকেশ, ধরি | বন্ধন-হারা | ধারা গঙ্গোত্রীর,
(২).৬.৬.৬.(২)
বল বীর— ৪
চির | উন্নত মম | শির। (২) ৬ (২)

উপরের উদ্ধৃতির পর্বভাগে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, ছয় মাত্রার চালে ছন্দস্পন্দ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রত্যেক চরণের আরম্ভে একটি দু-মাত্রার hypermetric বা ছন্দোতিরিক্ত পর্ব, পর্বের সাধারণ গতিকে কিছুটা গম্ভীর ও বিলম্বিত ক'রেছে—এবং চরণের শেষের বিভিন্ন মাত্রার খণ্ডপর্ব সেই গাম্ভীর্যের সীমা নির্দেশ করেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম চরণের কয়েকটি পর্বে সাধারণ গণনায় মাত্রাসংখ্যা

কম ব'লে প্রতীতি জন্মে কিন্তু শব্দাংশগত ঝোঁক সেখানে স্বল্পমাত্রার পরিধিকে বর্ধিত ক'রেছে তাই মাত্রার ন্যূনতা ত্রুটির কারণ হয়নি। 'যজ্ঞ', 'সৃষ্টি' এবং 'ধ্বংস' তিনটি শব্দে ইংরেজীর মতো সিলেব্‌ল্‌গত তীব্র ঝোঁকের সৃষ্টি হ'য়েছে এবং ঝোঁকের প্রভাব চরণের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত থেকে একটি সংহত ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি কর্‌ছে। এই দুইটি চরণে পয়ারের মতো যতি নির্দেশ করে আবার ভিন্নপ্রকার ছন্দ-স্পন্দও সৃষ্টি করা যায়ঃ

আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, | আমি অগ্নি ॥ ১০+৪
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস | আমি লোকালয় | আমি শ্মশান ॥
৮+৬+৫

অবশ্য এ-বিন্যাস অযথার্থ, কেননা এতে মূল কবিতার ছন্দ-রীতির সঙ্গে বিরোধ ঘটে।

Stress অথবা ঝোঁক স্বল্পমাত্রার পরিধিকে বর্ধিত ক'রেছে, এ-ধরণের নিদর্শন "বিদ্রোহী"তে আরও আছেঃ

(ক) আমি | অন্যায়, আমি | উল্কা, আমি | শনি (২).৬.৫.২
আমি | ধূমকেতু জ্বালা, | বিষধর কাল- | ফণি! (২).৬.৬.২
আমি | ছিন্নমস্তা | চণ্ডী, আমি | রণদা সর্ব | নাশী,
(২).৬.৫.৬২
আমি | জাহান্নামের | আগুনে বসিয়া | হাসি পুষ্পের |
হাসি! (২).৬.৬.৬.২

(খ) আমি | বেদুঈন, আমি | চেঙ্গিস্‌, (২).৬ ৪
আমি | আপনারে ছাড়া | করিনা কাহারে | কুর্ণিশ।
(২).৬.৬.৪
আমি | বজ্র, আমি | ঈশান-বিষাণে | ওঙ্কার, (২).৫.৬.৪
আমি | ইস্রাফিলের | শিঙ্গার মহা- | হুঙ্কার, (২).৬.৬.৪

(গ) আমি | দেব শিশু, আমি | চঞ্চল, (২).৬.৪
আমি | ধৃষ্ট, আমি | দাঁত দিয়া ছিঁড়ি | বিশ্ব-মায়ের |
অঞ্চল। (২).৫.৬.৬.৪

উপরের তিনটি উদাহরণেই পাঁচমাত্রার একটি ক’রে পর্ব র’য়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শব্দাংশগত ঝোঁকের জন্য মাত্রার স্বল্পতা ঘটেনি।

মোহিতলাল যাকে পদ-স্বচ্ছন্দ-পয়ার বলেছেন, ‘পূজারিণী’ কবিতাটি সেই ছাঁচে ঢালাই করা। এই কবিতার পদগুলো অসমান এবং তাদের সংখ্যারও স্থিরতা নেই। চরণে চরণে মিল আছে কিন্তু চরণগুলোর মাপ এক নয়। শব্দাংশগত ঝোঁক এখানে অনুপস্থিত কিন্তু phrasal accent বা বাক্যাংশগত ঝোঁকের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ঝোঁক প্রতি পদের আরম্ভে শ্রুতিগোচর হয়। কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত কর্‌ছি :

(ক) দি´নান্তের প্রান্তে বসি | আঁ´খি-নীরে তিতি ;
আ´পনার মনে আনি | তা´রি দূর দূরান্তে´র স্মৃতি—
ম´নে পড়ে | ব´সন্তের শেষে আসা | ম্লা´ন মৌন মোর |
অা´গমনী সেই নিশি
যে´দিন আমার আঁখি | ধ´ন্য হল তব আঁখি- | চাওয়া সনে
মিশি।

(খ) জ´ন্ম জন্ম ধরে চাওয়া | তুমি মোর সেই ভি´খারিণী।
অ´ন্তরের অগ্নি-সিন্ধু | ফু´ল হ’য়ে হেসে উঠে | ক’হে—চিনি,
চিনি !

বেঁচে ওঠ্ মরা প্রাণ | ড’াকে তোরে দূ’র হতে সেই
য’ার তরে | এ’ত বড় বিশ্বে তোর | সু’খ শান্তি নেই।

(গ) অ’ান্ তোর ব’হ্নি-রথ | ব’াজা তোর স’র্বনাশা তূরী !
হ’ান তোর পরশু-ত্রিশূল | ধ্ব’ংস কর্ এই মিথ’্যাপুরী !
র’ক্ত-সুধা-বিষ আন্ | ম’রণের ধর টিপে টু´ঁটি !
এ’ মিথ্যা জগৎ তোর | অ’ভিশপ্ত জগদ্দ´ল চাপে | হো´ক্
কুটি কুটি !

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, ডি, এণ্ডারসন এক সময় যে-উক্তি

করেছিলেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "My own suggestion is that Bengali phrasal accent, instead of being final as in French, is chiefly (though not always) initial, and that this quality is the basis of Bengali metre," এই উক্তি যে কতটা সত্য নজরুল ইস্‌লামের উপরে উদ্ধৃতির পদ-বিন্যাস ও ঝোঁক-নির্দেশক চিহ্ন দেখ্‌লেই আমরা বুঝ্‌তে পারবো।

ব্যঞ্জনবর্ণের আধিক্য ও ঘন ঘন যুক্তাক্ষর বিন্যাস এই উভয় কারণেই ইংরেজী ছন্দের মতো বাংলা ছন্দেও নজরুল ইস্‌লাম প্রবল আঘাত-মূলক ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টি কর্‌তে পেরেছিলেন। আবার পর্বান্ত হসন্তবর্ণ যতদূর সম্ভব বর্জন ক'রে স্বর-প্রসারণের সুযোগ না দিয়েও বাংলা ছন্দে শব্দাংশগত ঝোঁক আন্‌তে পেরেছিলেন, যেমন ঃ

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন !
দুর্বল ! ভীরু ! চুপ রহো, ওহো খামকা ক্ষুব্ধ মন !
ধ্বনি উঠে রণি' দূর্ বাণীর,—
আজিকার এ খুন্ কোর্ বাণীর !
দুম্বা-শির রুম্-বাসীর
শহীদের শির-সেরা আজি | রহমান কি রুদ্র নন ?

এটা পড়তে হবে এভাবে ঃ

ওরে হ´ত্যা-নয়া´জ সত´্যাগ্র´হ শক্তি´রুদ্বো´ধন´।
দু´র্বল ! ভীরু চু´র্পহো-ওহো´ খাম´কা-ক্ষুব্ধ´-ম´ন।
ধ্ব´নি উঠে রণি' দূর্ব´াণীর,—
আজিক´ারে-খুন কোর্ব´াণীর।
দুম্ব´া-শির রুম্বা´সীর

এখানে স্বর প্রসারণের কোনো অবকাশ না দিয়ে কবি অপূর্ব ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টি করেছেন।

নজরুল ইস্‌লাম ছন্দ ও মিলের বিচিত্র চাতুর্য দেখিয়েছেন "ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম" কবিতায়। ভাবগত সৌন্দর্য প্রায়ই অব্যাহত থাকেনি, শব্দ ও সুরের মোহনীয়তায় কবির মন অত্যন্ত বেশী আচ্ছন্ন হ'য়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাবার জন্যই কবিতাটি লেখা। কবিতাটির মিলের ও ছন্দের বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করবো।

(ক) মিলের বৈচিত্র্য ঃ

নাই তাজ
তাই লাজ ?
ওরে মুস্‌লিম্‌ খরর্জু-শীষে তোরা সাজ !
ক'রে তস্‌লিম্‌ হর্‌ কুর্ণিশে শোর্‌ আওয়াজ।

এখানে প্রতি চরণে অন্তঃস্থিত মিল ছাড়াও চরণে পর্বগত এমন কি শব্দগত মিলও র'য়েছে। প্রথম চরণের 'নাই', পরবর্তী চরণের একই স্থানস্থিত 'তাই' এর সঙ্গে মিল সৃষ্টি করেছে; তৃতীয় চরণের প্রথম শব্দ চতুর্থ চরণের প্রথম শব্দের সঙ্গে, প্রথম পর্বের সঙ্গে প্রথম পর্বের এবং এভাবে অন্যান্য শব্দ, পর্ব ও চরণের মিল সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) শুধু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের সংলগ্ন-প্রয়োগে ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টি ঃ

উর্‌জ্‌ য়্যামেন্‌ নজ্‌দ হেযাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহারাণ—স্মরি কাহার বিরাট নাম

* * *

আজি বান্দা যে ফের্‌উন্‌ শাদ্দাদ্‌ নম্‌রুদ মারোয়ান্‌

* * *

এয়্‌ শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জমাঁ সালাম

* * *

রোয়ে ওয যা হোবল্‌ ইব্‌লিস খারেজিন

(গ) অক্ষরগত ও ঝঙ্কারগত অনুপ্রাসের প্রয়োগ ঃ

দূরে ঘূর্ণীর তালে সুর বুনে হুরী ফূর্তির র
ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরাণী দূরাণী তুর্কীর র

* * *

শোন্ দামাম্ কামান্ তামাম্ সামাম্
নির্ঘোষি কার নাম ম ন

শব্দের দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃতি ও ধ্বনি প্রকাশ করবার চেষ্টা 'ঝড়' কবিতায় পাওয়া যায়। ঝড়ের অনুভূতি নয়, ঝড়ের আলোড়ন ও গতি তিনি শব্দবিন্যাসের মধ্যে তুলে ধ'রতে চেয়েছেন। ঝড়ের প্রথম অবস্থায় স্তব্ধ প্রকৃতির আকস্মিক মত্ততা, ঝড়ের পূর্ণতায় দুরন্ত দুর্যোগ এবং সর্বশেষে বৃষ্টির অবিরল ধারায় প্রকৃতির শান্তশ্রী শুধু শব্দ-বিন্যাসের মধ্যেই কবি তু'লে ধরেছেন।

ঝড়ের সূচনার পরিচয় কবি দিয়েছেন এভাবে ঃ

"ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্ কড়কড় কড়
কাঁদে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে।
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরি শিরে,
যাত্রা মোর জন্মি আচম্বিতে
প্রাচী'র অলক্ষ্য পথ-পানে।
মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি
ছুটে চলি অনির্দেশ অনর্থ-সন্ধানে!"

ঝড়ের উদ্দামতার পরিচয় পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে ঃ

'ঝড়—ঝড়—উড়ে চলি ঝড়
মহাবায় পঙ্খীরাজে চড়ি'
পড়-পড় আকাশের ঝোলা সামিয়ানা
মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি।

প্রমত্ত সাগর-বারি—অশ্ব মম তুফানীর খর-ক্ষুর বেগে
আন্দোলি' আন্দোলি' ওঠে, ফেনা ওঠে জেগে
ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ-মুখে তার !"

বৃষ্টির শেষে প্রকৃতির প্রশান্ত অবস্থার পরিচয় ছন্দের ক্লান্ত গতিতে প্রকাশ করেছেন :

"সজল কাজল-পক্ষ্ম কে সিক্ত-বসনা একা ভিজে—
বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশ কালোমেঘে পিঁজে ।
নয়ন-গগনে তার নেমেছে বাদল, ভিজিয়াছে
চোখের কাজল,
মলিন করেছে তার কালো আঁখি-তারা বায়ে-ওড়া
কেতকীর পীত পরিমল ।"

ইন্দ্রিয় প্রসূত
অনুভূতির

অবশ্য এ কবিতাটি সত্যিকার অনুভূতির সৃষ্টি নয়, প্রয়াসের ফল। এখানে ছন্দের ও শব্দবিন্যাসের চাতুর্য আছে, যে ধরণের চাতুর্যের পরিচয় আমরা ইংরেজ কবি টেনিসনের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পঙক্তিতে পাই :

"Sweeter thy voice, but every sound is sweet
Myriads of rivulets hurrying through the lawn,
The moan of doves in immemorial elms,
And murmuring of innumerable bees."

দ্বিতীয় চরণে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোতের প্রবাহকে, তৃতীয় চরণে ঘুঘু'র ক্লান্ত সুরকে এবং সর্বশেষ চরণে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনিকে শব্দের ঝংকারের মধ্যে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে। এই কুশলতার অভাব নজরুল ইস্‌লামের মধ্যে কখনও হয়নি, কিন্তু কুশলতার আতিশয্য ঘটলে যে সর্বনাশ হয়, তা'কে তিনি দূরে ঠেলতে পা'রেননি। আবার যেখানে অনুভূতিকে অনুসরণ করে ছন্দ ও ভাষা রূপ লাভ ক'রেছে সেখানে আমরা পরিপূর্ণ জীবনবোধের পরিচয় পাই। যেমন :

"দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ !"

অথবা ঃ

"নিরন্ধ্র মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাতি
কুহেলি-অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি,—
চলে পথহারা অন্ধ দেবতা ধীরে ধীরে এরি মাঝে,
সেই পথে ফেলে চরণ—যে পথে কঙ্কাল পায়ে বাজে !"

অথবা ঃ

"প্রাণ-প্রবাহের প্রবল-বন্যা, বেগে খর-স্রোতা নদী
ভেঙেছে দুকূল, সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি।
জলধির মহা-তৃষ্ণা জাগিছে যে বিপুল নদী স্রোতে,
সে কি দেখে, তা'র স্রোতে কে ডুবিল,
কে মরিল তার পথে ?"

উপরের কয়েকটি উদ্ধৃতিতে আমরা দেখিতে পাচ্ছি যে, শব্দ-বিন্যাসের, পর্বের ও পদভাগের মধ্যে বিশিষ্টতা রয়েছে, কিন্তু কোথাও ইচ্ছাপ্রসূত চাতুর্যের পরিচয় নেই। অনুভূতি আপন গতিপথ আপনিই সৃজন ক'রে নিয়েছে। ছন্দ ভাবানুসারী এবং সে-কারণে বক্তব্যও পূর্ণাঙ্গ ; প্রকাশের দীপ্তি অন্তরের সৌকর্যে'র প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন, "আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে, গন্ধে, রূপে, রসে, বোধের জাল বিস্তার ক'রে চলেছে, আমাদের

ভাষাও তেমনি সৃষ্টি ক’রছে, কত ছবি, কত রস—তার ছন্দে, তার শব্দে কত রকমের ~~তা’র~~ যাদু-শক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হ’য়ে থাকে ইতিহাসের রণভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহতারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষারঙ্গের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ কিন্তু বাণীলোকের রহস্যের বিস্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহু লক্ষ তারা-চলার পথ পেরিয়ে আজ আমাদের চোখে এসে পৌঁছল, কিন্তু তার চেয়ে আরো অনেক বেশি আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকাচক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ ক’রতে পেরেছে।”

এই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ ক’রবার দুঃসাহস কখনও কখনও নজরুল ইস্‌লামের কাব্যকে নীতিবোধহীন আবেগের উন্মত্ততায় নৃত্যরত ক’রেছে, আবার কখনও কখনও দৃষ্টির অন্তরালের এক মোহনীয় আলোকে উদ্ভাসিত ক’রেছে। নজরুল ইস্‌লামের ছন্দে ও শব্দবিন্যাসে আমরা এই দুই বিরুদ্ধ আবেগেরই পরিচয় পাই।

নজরুল ইস্‌লামের ছন্দ সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। মোহিতলালের মন্তব্য অবশ্যই মূলতঃ প্রশস্তি। নজরুল ইস্‌লাম ছন্দকে রক্ষা করে তার মধ্যে আবেগকে যে প্রবহমান রাখ্‌তে পেরেছেন, বর্তমান যুগের কাব্যক্ষেত্রের অব্যবস্থার দিনে তা’ যে কতটা অপূর্ব তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। মন্তব্যটি উদ্ধৃত করছি।

‘‘কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী

কণ্ঠভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ-প্রীতিকর প্রাণহীন চারুচাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বর সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃ উৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। 'খেয়া পারের তরণী' শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রা বিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে ; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটা অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই ; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে, ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩২৭ সালের ভাদ্রের "মোস্‌লেম ভারত"-এ। নজরুল ইস্‌লামের কাব্য-প্রতিভার ক্রমবিকাশের দিক থেকে বিচার ক'র্‌লে এই মন্তব্যের যথেষ্ট মূল্য আছে।

প্রতিধ্বনি

বিদ্রোহী

বল বীর—
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-
বিধাত্রীর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত
জয়শ্রীর !
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির ।

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !

আমি ধূর্জটী, আমি এলোকেশে ঝড়
অকাল-বৈশাখীর !
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত
বিশ্ব-বিধাত্রীর ।

বল বীর—
চির উন্নত মম শির !

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি' ।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ !
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চলচঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্ !
আমি চপলা-চপল হিন্দোল ।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা !
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর ।
আমি শাসন-ত্রাসন সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর ।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির ।

আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান !

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আমি ইন্দ্রাণি-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য !
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল,
ধর্ম্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড !
আমি ক্ষ্যাপা দুর্ব্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব !
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস—আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস !
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী !
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল্-দোল্ !—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম,
আমি ধন্যি ।
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হা-হুতাশ
আমি হুতাশীর !
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা
যত পথিকের,

[illegible]

আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত
বুকে গতি ফের !
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ
কুমারীর !
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল-ক'রে দেখা-অনুখণ,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র
কাঁকন চুড়ির কন-কন্ ।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর
কাঁচলি নিচোর !
আমি উত্তর বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস
পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া !
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি ।—
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে
সব বাঁধ !

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন ।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ-মর্ত্য-করতল,
তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে !

[illegible]

আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া,
দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চরি' ভূমি-কম্প।

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্-ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি,
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী!
আমি রুষে উঠে' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে
যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া।

[illegible]

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণি!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

[illegible]

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!

[illegible]

আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব
সৃষ্টির মহানন্দে,
মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশ বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির !

পুনরাবৃত্তি,
কবির মনে
প্রচণ্ড ক্ষোভ
তবে শুভেচ্ছা
এই পুনরাবৃত্তি
প্রচণ্ড ক্ষোভকে
[illegible]

শিব-সুন্দরম্‌ শিবের এক রূপ যেখানে
(chaotic dance) এক রূপ যেখানে সৃষ্টির মঙ্গল
রুদ্র তাণ্ডব।, অপর (cosmic dance)
-সৃষ্টি নব সৃষ্টিতে। কবির অন্তরেও যেমন
দেখি বিপরীত শক্তির যোজনা বা পাশাপাশি বর্তমান
সহাবস্থান।

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

আজ স্থষ্টি-সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন্ হাসে
আজ স্থষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে—
বান ডেকে ঐ জাগ্‌ল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ স্থষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আস্‌ল উদাস, শ্বস্‌ল হুতাশ,
স্থষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুল্‌লো সাগর দুল্‌লো আকাশ ছুট্‌লো বাতাস,
বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক-পাণির শূল আসে। মহাদেব, ত্রিশূল (শিবের)
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় স্থষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে।
আজ স্থষ্টি-সুখের উল্লাসে!

খর গ্রীষ্ম

আজ হাস্‌ল আগুন, শ্বস্‌ল ফাগুন,
মদন মারে খুন্-মাখা তূণ

পলাশ অশোক শিমূল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্‌-বাসে
গো দিগ্‌ বালিকার পীতবাসে ;
আজ রঙন এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ কপট কোপের তূণ ধরি,
ঐ আস্‌ল যত সুন্দরী
কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে—
তাদের-প্রাণের-'বুক-ফাটে-তাও মুখ-ফোটে-না' বাণীর-বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ আস্‌ল ঊষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আস্‌ল নিকট, আস্‌ল সুদূর,
আস্‌ল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা-গাজন-উচ্ছ্বাসে !
ঐ আস্‌ল আশিন শিউলি শিথিল
হাস্‌ল শিশির দুব্‌ঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ জাগ্‌ল সাগর, হাস্‌ল-মরু,
কাঁপ্‌ল ভূধর, কানন-তরু,

বিশ্ব-ডুবান্ আস্‌ল তুফান, উছ্‌লে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বাম পাশে!

মন ছুট্‌ছে গো আজ বল্গা-হারা অশ্ব যেন পাগ্‌লা সে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!!

বিষের বাঁশী

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ !
গাইবি আবার কণ্ঠ ছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান ।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

আয়রে আমার বাঁধন-ভাঙার তীব্র সুখ
জড়িয়ে হাতে কাল্-কেউটে গোখ্‌রো নাগের
পীত্ চাবুক !
হাতের সুখে জ্বালিয়ে দে তোর সুখের বাসা ফুল-বাগান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

বুঝিস্‌নি কি কাঁদায় তোরে তোরই প্রাণের সন্ন্যাসী !
তোর অভিমান হ'ল শেষে তোরই গলায় নীল ফাঁসি !
(তোর) হাসির বাঁশী আন্‌লে বুকে যক্ষা-রুগীর রক্ত-বান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

ফানুস-ফাঁপা মানুষ দেখে হায় অবোধ
ছুটে এলি ছায়ার আশায়
মাথায় তেম্‌নি জ্বল্‌ছে রোদ ।
ফাঁকির ফানুস ছাই হ'ল তোর
খুঁজিস এখন রোদ-শ্মশান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !
তুই যে আগুন, জল্-ধারা চাস কার কাছে ?
বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে ।
ফুলের মালার হুলের জ্বালায় জ্বলবি কত অগ্নি-স্নান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

অগ্নি-ফণি ! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস্ চুমা,
পাহাড়-ভাঙা জাপ্‌টানী তোর—ভাবিস্ সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া !
মৃত্যুও যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু-টান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

সুখের লালস শেষ করে দে, স্বার্থপর !
কাল্-শ্মশানের প্রেত-আলেয়া ! তুই কোথা বল্
বাঁধ্‌বি ঘর ?
ঘর-পোড়ানে ত্রাস-হানা তুই সর্বনাশের লাল-নিশান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

সাপ ধরে তুই চাপ্‌বি বুকে
সইবে না তোর ফুলের ঘা,
মার্‌তে তোকে বাজ পাবে লাজ
চুমুর সোহাগ সইবে না !
ডাক-নামে ডাক তোর তরে নয়,
আহ্বান তোর ভীম কামান ।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

ফণী-মনসার কাঁটার পুরে
আয় ফিরে তুই কাল্-ফণী,
বিষের বাঁশী বাজিয়ে ডাকে নাগ-মাতা—
"আয় নীলমণি !"

ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রামী ছাড়্,
ধর্ ক্ষ্যাপা তোর অগ্নি-বাণ !
আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ !

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

নাই তা—জ !
তাই লা—জ ?

ওরে মুস্‌লিম্, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ !
ক'রে তস্‌লিম হর্ কুর্ণিশে শোর্ আ-ওয়াজ
শোন্ কোন্ মুঝ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ !

উর্‌জ্‌ য়্যামেন্ নজ্‌দ হেজাজ্‌ তাহামা ইরাক্ শাম
মেসের্ ওমান্ তিহারান—স্মরি' কাহার বিরাট নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি সাল্‌লাম্ !"

চলে আঞ্জাম্,
দোলে তাঞ্জাম,
খোলে হুর্-পরী মরি ফির্‌দৌসের্ হাম্মাম্ !
টলে কাঁখের কলসে কওসর্ ভর্, হাতে 'আব্‌-জম্-জম্-জাম্ ।
শোন্ দামাম্ কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি' কার্ নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি সাল্‌লাম্ !"

(২)

মস্ তান !
ব্যস্ থাম্ !
দেখ্‌ মশ্‌গুল্‌ আজি শিস্তান্ বোস্তান,
তেগ্‌ গর্দানে ধরি দারোয়ান্ রোস্তাম্ ।

বাজে কাহারবা বাজা, গুল্‌জার গুল্‌শান্
গুল্‌ফাম্ !
দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে বাগে-বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন্-জোশীতে রে লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ !
নূরে কুর্শির
পুরে 'তুর্'-শির,
দূরে ঘূর্ণীর তালে সুর্ বুনে হুরী ফূর্তির,
ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরাণী দূরাণী তুর্কীর !
আজ বেদূইন্ তা'র ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
ছুড়ে' ফেলে' বল্লম্
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি সাল্‌লাম্ !"

(৩)

'সাবে ঈন্'
তাবে ঈন্
হ'য়ে চিল্লায়্ জোর "ওই ওই নাবে 'দীন্' !"
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত্ মানাত'-এর ওয়ারেশীন্ ।
রোয়ে ওয্‌যা হোবল্' ইব্‌লিস্ খারেজীন্,—
কাঁপে জীন্ !
জেদ্দার পূবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বৎ,
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ্ হর্ ওক্ত্,
ঘন উথলে অদূরে 'জম্-জম্' শরবৎ !
পানি কও্‌সর,
মণি জও্‌হর্
আনি 'জিব্‌রাইল্' আজ্ হরদম্ দানে গও্‌হর্,
টানি' 'মালিক্-উল্-মৌত্' জিঞ্জির—বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর্ ।

হানি' বরষা সহসা 'মিকাইল্' করে
উষর আরবে ভিঙ্গা,
বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন'ইস্‌রাফিল'-এর শিঙ্গা !

(৪)

জন্ জাল
কণ্ড্ কাল
ভেদি',— ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পঞ্জার
ছেদি',— মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার !
বেদী— পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার
ওঙ্কার !
শঙ্কারে করি' লঙ্কার পার কা'র ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার ?
ভূমা- নন্দে রে সব টুটেছে অহং-কার !
মর- মর্মরে
নর- ধর্ম রে
বড় কর্মরে দিল ইমানের জোর্ বর্ম রে,
ভর্ দিল্ জান—পেয়ে শান্তি নিখিল্ ফিরদৌসের হর্ম্য রে !
রণে তাই ত বিশ্ব-বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ—
"ওয়ে মার্‌হাবা ওয়ে মার্‌হাবা এয়্ সর্‌ওয়ারে কায়েনাত !"

(৫)

শর্ ও্য়ান
দর্ ও্য়ান,
আজি বান্দা যে ফের্‌উন শাদ্দাদ্ নম্‌রুদ মারোয়ান্ ;
তাজি বোর্‌রাক্ হাঁকে আস্‌মানে পর্‌ওয়ান্,—
ও যে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোর হান্—
'কোর্-আন্' !

“কোন্ যাদুমণি এলি ওরে” ব’লি রোয়ে মাতা আমিনায়
খোদার হবিবে বুকে চাপি, আহা বেঁচে আজ স্বামী নাই !
দূরে আব্‌দুল্লার রুহ কাঁদে “ওরে আমিনারে ‘গমি’ নাই—
দেখ সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ, সব ভর-পূর্ ‘কমি’ নাই !”
“এয়্ ফর জন্দ্”—
হায় হর্‌দম্
ধায় দাদা মোত্‌লেব্ কাঁদি’,—গায়ে ধূলা কর্দম !
“ভাই ! কোথা তুই ?” বলি’ বাচ্চারে কোলে কাঁদিছে
হাম্‌জা’ দুর্দম !
ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হ’তে জোর-শোর আসে,
ভাসে ‘কালাম’—
“এয়্ শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জমাঁ সালাম !”

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁওয়া লেগে,
মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মত মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি' ॥

নব জীবনের 'ফোরাত'-কূলে গো কাঁদে 'কারবালা' তৃষ্ণাতুর,
ঊর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়ুরোপ-'এজিদের' সেনা এপার ওপার নিকট দূর,
এরি মাঝে মোরা 'আব্বাস' সম পানি আনি প্রাণ পণ করি' !

যখন জালিম্ 'ফেরাউন' চাহে 'মুসা' ও সত্যে মারিতে ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই,
আজো 'নমরুদ ইব্রাহিমেরে' মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প মঞ্জরী ॥

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরা-জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।
মোদের আশার ঊষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে,
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্বরী ॥

নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হ'তে।
ভবিষ্যতের স্বাধীন-পতাকা উড়িবে যে দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে ওগো তোমাদের সুখ স্মরি'।

পলাতকা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা ?
ওরে আমার পলাতকা !
তোর প'ড়লো মনে কোন্ হারা ঘর,
স্বপন-পারের কোন্ অলকা ?
ওরে আমার পলাতকা !

তোর জল ভ'রেছে চপল চোখে,
বল্ কোন্ হারা-মা ডাক্‌লো তোকে রে ?
ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—
উতল পাগল ! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে ?
যেন বুক ভরা ও' গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, 'আয়,
ওরে আয় আয় আয়,
কোলে আয় রে আমার দুষ্টু খোকা !
ওরে আমার পলাতকা !'
দখিন্ হাওয়ায় বনের কাঁপনে—
দুলাল আমার ! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর
ডাক দিয়েছে আজ ?
এতদিনে চিন্‌লি কি রে পর ও আপনে !
নিশিভোরেই তাই কি আমার নাম্‌লো ঘরে সাঁঝ ।

ধানের শীষে, শ্যামার শিষে—
যাদুমণি ! বল্‌ সে কিসে রে,
তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়্‌লি বাঁধন !
চোখ-ভরা তোর উছ্‌লে কাঁদন রে !
তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে !
যেন আচম্‌কা কোন্ শশক-শিশু চম্‌কে ডাকে হায়,
"ওরে আয় আয় আয়—
আয় রে খোকন আয়,
বনে আয় ফিরে আয় বনের চখা !
ওরে চপল পলাতকা ॥"

শায়ক-বেঁধা পাখী

রে নীড়-হারা, কচি বুকে শায়ক-বেঁধা পাখী ?
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?
কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে ?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি কিছুই দেখি না যে ?
ওরে মাণিক ! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে—
তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষপুটে ঢাকি'।
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

বক্ষে বিঁধে বিষ-মাখানো শর,
পথ-ভোলারে ! লুটিয়ে প'লি এ কার বুকের 'পর ?
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর ?
তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি ?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী ।
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হায় এ কোথায় শান্ত খুঁজিস্ তোর ?
ডাক্‌ছে দেয়া, হাঁক্‌ছে হাওয়া, কাঁপ্‌ছে কুটীর মোর !
ঝঞ্ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর,
দুলে দুঃখ-রাতের অসীম রোদন বক্ষে থাকি' থাকি'
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী
এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে,
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে !
মাণিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে
ওরে তাইত ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি !
ওরে আমার হারামণি ! ওরে আমার পাখী
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হারিয়ে পাওয়া ওরে আমার মাণিক !
দেখেই তোরে চিনেছি, আয় বক্ষে ধরি খানিক !
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,
ওরে হারার ভয়ে ফেল্‌তে পারে চিরকালের মা কি ?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী,
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

এ যে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুইত আমার ন'স্ রে অতিথ অতীত কালের কেহ,
বারেবারে নাম হারায়ে এসেছিস্ এই গেহ,
এই মায়ের বুকে থাক যাদু তোর য'দিন আছে বাকী !
প্রাণের আড়াল কর্‌তে পারে সৃজন দিনের মা কি ?
হারিয়ে যাওয়া ? ওরে পাগল, সেত চোখের ফাঁকি !

চিরশিশু

নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন্ দেশ পারায়ে।
কোন্ নামের আজ পর্‌লি কাঁকন, বাঁধন-হারার কোন্ কারা এ॥
আবার মনের মতন ক'রে
কোন্ নামে বল্ ডাক্‌ব তোরে!
পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে
বারেবারে নাম হারায়ে॥

ওরে যাদু ওরে মাণিক আঁধার ঘরের রতন-মণি!
ক্ষুধিত ঘর ভর্‌লি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী!
আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
কান্না-সায়র উথ্‌লে বুকে,
নতুন নামে ডাক্‌তে তোকে
ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে
উঠ্‌ছে কেন মন ভারায়ে!
অস্ত হ'তে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে॥

অ-কেজোর গান

ঐ	ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটীর ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥

এই	রোদ-সোহাগী পউষ প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে
পুষ্পল মৌ-ক্ষেতে ।
আমি	আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে ॥

আজ	কাশ-বনে কে শ্বাস ফে'লে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হল্‌দে আঁচল চল্‌তে জড়ায় অড়হরের ফুলে !
ঐ	বাব্‌লা ফুলে নাকছাবি তার,
গায় শাড়ি নীল অপ্‌রাজিতার,
চ'লেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে ।

আমায় ডেকে'ছে সে চোক-ইসারায় পথে যেতে যেতে ।
ঐ	ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটীর ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে ॥

কাণ্ডারী হুশিয়ার !

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান !
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ !
"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ !
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ ?
ক'রে হানাহানি, তবু চল টানি নিয়াছ যে মহাভার !

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি, অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুশিয়ার!

মানুষ

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্ !
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি—

'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে, পূজার সময় হোলো !'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়.!—
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ—
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনিক সাতদিন !'
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মাণিক জ্বলে !
ভুখারী ফুকারী কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !'

মস্‌জিদে কাল শির্‌ণী আছিল,—আঢেল গোশ্‌ত্ রুটী
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন্
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন !'

তেরিয়াঁ হইয়া হাঁকিল মোল্লা—"ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর' গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?"
ভুখারী কহিল "না বাবা।" মোল্লা হাঁকিল—"তাহ'লে শালা
সোজা পথ দেখ!" গোশ্‌ত্‌ রুটী নিয়া মস্‌জিদে দিল তালা!
ভুখারী ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে—
"আশীটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা' ব'লে বন্ধ করনি প্রভু!
তব মস্‌জিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী।
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী!"

কোথা চেঙ্গিস্‌, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা
সব দ্বার এর খোলা রবে। চালা হাতুড়ি শাবল চালা!
হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়! ✓

মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে, মরি মরি!
ও' মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে।
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল!—মূর্খরা সব, শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ,—গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।
আদম দাউদ ঈশা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর—বিশ্বের সম্পদ।

[illegible]

[illegible]

আমাদেরি এঁরা পিতাপিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরি রক্ত কম বেশী ক'রে প্রতি ধমনীতে রাজে!
আমরা তাঁদেরি সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরি মতন দেহ।
কে জানে কখন্ মোরাও অমনি হ'য়ে যেতে পারি কেহ।
হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি কে জানে, কে আছে
আমাতে মহামহিম।

—=—

[illegible]

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা ।—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার !

কবি দারিদ্র্যকে
জীবনের পাথেয়
[illegible] দেখেছেন।

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক । আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ !

বেদনা হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে তুমি হে নির্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম !
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির সজল

টলটল ধরণীর মত করুণায় !
তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়

করুণা-নীহার-বিন্দু !   ম্লান হ'য়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে !   স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের !   তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল ?'
জ্বালা নাই নেশা নাই নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে।
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা !…'
গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা !…

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা !   যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন্
রে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক,—'মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে আছে দুঃখ আরো
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর্ ভোগ !'—পড়ে হাহাকার
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি !
চল-পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,
দু' নয়ন ভরি রুদ্র হান অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,

প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা !

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ সরম বলি জাননাক' কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে !
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছে মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে !
লক্ষ্মীর কিরীটী ধরি ফেলিতেছ টানি
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী ?
যত সুর আর্তনাদ হ'য়ে ওঠে শুনি !

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে ! যেন আসে নাই
আজো কা'রা ঘরে ফিরে ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে 'সানাইয়া' !
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে ! সখি বলে, বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি মুছিলি কাজল ?…
শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভ'রি !

নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
চুম্বনে বিবশ করি'! ভোমোরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ!
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের! অকারণে আঁখি
পূ'রে আসে অশ্রু-জলে! মিলনের রাখি
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে!
পুষ্পাঞ্জলি ভরি' দুটি মাটী-মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার!—
সহসা চমকি উঠি! হ'য়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাওনিক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি! (কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব অনিন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব?—ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস!...)

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই কিছু নাই।

বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ জাগার সাথী !
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি !
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, "মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকী !"
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায় ঢুলু ঢুল্,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল্ !—

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কা'র নিশ্বাস লাগে ?
কে করে ব্যজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে ?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি !

তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে
সারারাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে !—
জাগিয়া একাকী জ্বালা ক'রে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হ'ত যেন সুশীতল করতল

আমার প্রিয়ার !—তোমার শাখার পল্লবমর্মর
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির্ ঝির্ মির্ মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তা'রির সাড়ীর আঁচল খানি।
—তোমার পাখার হাওয়া
তা'রি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-ছাওয়া !

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি,—তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি'।

হয়ত স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশ খানি,
বাতায়নে ঠেকি' ফিরিয়া এসেছে, লইয়াছি লাজে টানি'।
বন্ধু, এখন রুদ্ধ করিতে হইবে সে বাতায়ন !
ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা, "কর বিদায়ের আয়োজন !"
—আজি বিদায়ের আগে

আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন ?
জানি—মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,
কে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি !

হয়ত-ত-তোমারে দেখিয়াছি, তুমি যাহা নও তাই ক'রে,
ক্ষতি কি তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে ?
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোম্‌তাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ-ম'ল,
—বল তাহে কার ক্ষতি ?
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী !

হয়ত তোমার শাখায় কখনো বসে নি আসিয়া পাখী,
তোমার কুঞ্জে পত্রপুঞ্জে কোকিল ওঠে নি ডাকি'।
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
জেগেছ নিশীথে জাগেনিক' সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।
—সব আগে আমি আসি'
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ, গিয়াছি গো ভালবাসি !
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক্ সান্ত্বনা মোর, হোক্ বা না হোক্ দেখা।

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
—নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।—

শুধাইতে নাই, তবুও শুধাই আজিকে যাবার আগে—
ঐ পল্লব-জাফ্‌রি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে
দেখেছ আমারে—দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি' ?
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দুলি' ?

তোমার পাতার হরিৎ আঁচলে চাঁদিনী ঘুমাবে যবে,
মূর্ছিতা হবে সুখের আবেশে,—সে আলোর উৎসবে
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর ?
তোমার নিশাস শূন্য এ ঘরে করিবে কি হাহাকার ?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে ?
খড়্‌খড়ি খুলি চেয়ে রবে দূর অস্ত অলখ-লোকে ?—
—অথবা এমনি করি'
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন খেয়ানে সারা দিনমান ভরি' ?

মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি, উর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু।
দিবসে পুড়িছে রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে !
তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে,
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে !···

* * * *

ভুল ক'রে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি।
যদি ভুল ক'রে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি',
বন্ধ করিয়া দিও পুনঃ তায় !··(তোমার জাফ্‌রি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে—মাটিতে পেলে না যাকে)

চমৎকার

———

এ মোর অহঙ্কার

নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি কর্‌ব সৃজন—এ মোর অহঙ্কার !
এম্‌নি-চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখ্‌ল প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই। আমার স্বপনে
তুমি নিখিল-রূপের রাণী—মানস-আসনে !—

সবাই যখন তোমায় ঘিরে কর্‌বে কলরব,
আমি দূরে ধেয়ান-লোকে রচ্‌ব তোমার স্তব !
রচ্‌ব সুরধুনী-তীরে
আমার সুরের উর্বশীরে,
নিখিল-কণ্ঠে দুল্‌বে তুমি গানের কণ্ঠ-হার—
কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনার !

যেদিন আমি থাক্‌বনাক থাক্‌বে আমার গান,
বল্‌বে সবাই, "কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ ?"
আকাশ-ভরা হাজার তারা
রইবে চেয়ে তন্দ্রাহারা,
সখার সাথে জাগ্‌বে রাতে, চাইবে আকাশে,
আমার গানে পড়্‌বে মনে আমায় আভাসে !

বুকের তলা কর্‌বে ব্যথা বল্‌বে কাঁদিয়া,
"বন্ধু! সে কে তোমার গানের মানসী প্রিয়া?"
হাসবে সবাই, গাইবে গীতি,—
তুমি নয়ন-জলে তিতি'
নতুন ক'রে আমার গানে আমার কবিতায়
গহীন নিরালাতে ব'সে খুঁজ্‌বে আপনায়!

রাখ্‌তে যেদিন নারবে ধরা তোমায় ধরিয়া,
ওরা সবাই ভুল্‌বে তোমায় দু'দিন স্মরিয়া,
আমার গানের অশ্রুজলে
আমার বাণীর পদ্মদলে
দুল্‌বে তুমি চিরন্তনী চির-নবীনা!
রইবে শুধু বাণী, সেদিন রইবে না বীণা!

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি কর্‌ব সৃজন এ মোর অহঙ্কার!
এই ত আমার চোখের জলে,
আমার গানের সুরের ছলে,
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাক্‌ছ ইশারায়!…

চাইনা তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে!
ঊর্ধ্বে তোমার—তুমি দেবী,
কি হবে মোর সে রূপ সেবি'?
চাই না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল
একটু দুখে অভিমানে নয়ন টলমল!

যেমন ক'রে খেল্‌তে তুমি কিশোর বয়সে—
মাটীর মেয়ের দিতে বিয়ে মনের হরষে।
বালু দিয়ে গড়্‌তে গেহ,
জাগ্‌ত বুকে মাটীর স্নেহ,
ছিল না ত স্বর্গ তখন সূর্য তারা চাঁদ,
তেম্‌নি ক'রে খেল্‌ব আবার পাত্‌বে মায়া-ফাঁদ!

মাটীর প্রদীপ জ্বাল্‌বে তুমি মাটীর কুটীরে,
খুশীর রঙে কর্‌বে সোনা ধূলি-মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে ॥
উঠবে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকী-আধখানা চাঁদ হাস্‌বে ধরাতে,—
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়্‌বে তোমার খোঁপায় জড়াতে!

তুমি আমার বকুল যূঁথি—মাটীর তারা-ফুল,
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পার্সি-দুল।
কুসুমী-রাঙা শাড়িখানি
চৈতী-সাঁঝে পর্‌বে রাণী,
আকাশ-গাঙে জাগ্‌বে জোয়ার রঙের রাঙা বান,
তোরণ-দ্বারে বাজ্‌বে করুণ বারোয়াঁ মূলতান।

আমার-রচা গানে তোমায় সেই বেলা-শেষে
এম্‌নি সুরে চাইবে কেহ পরদেশী এসে!
রঙীন সাঁঝে ঐ আঙিনায়
চাইবে যারা, তাদের চাওয়ায়
আমার চাওয়া রইবে গোপন।—এ মোর অভিমান
যাচ্‌বে যারা তোমায়—রচি তাদের তরে গান!

নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর-সভায় !
তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হ'ল মগন !
কাজ কি জেনে—কাহার আশায় গাঁথ্‌ছ ফুল-হার,
আমি তোমার গাঁথ্‌ছি মালা এ মোর অহঙ্কার !

আমি গাই তারি গান

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে
তাদের ভাঙার ইতিহাস-লেখা। (যাহাদের নিঃশ্বাসে
জীর্ণ পুঁথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।
যারা ভেঙে চলে অপ-দেবতার মন্দির আস্তানা,
বক-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়ি-খানা।)
যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।
মিথ্যা মোহের পূজা-মণ্ডপে যাহারা অকুতোভয়ে
এল নির্মম—মোহ মুদ্গর ভাঙনের গদা লয়ে
বিধি নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে
দু' হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল। গোরস্থানেরে চ'ষে
ছুঁড়ে ফেলে যত শব কঙ্কাল বসাল ফুলের মেলা,
যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু-বেলা।

—গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।
—সে দিন নিশীথ বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'।

আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে।
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে
নব জগতের দূর-সন্ধানী অসীমের পথ-চারী,
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী!

সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে'
জীবনোদ্বেগে, তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মাণিক আহরি আনে যারা খুঁড়ি' পাতাল যক্ষপুরী;
নাগিনীর বিষ-জ্বালা স'য়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।
হানিয়া বজ্র-পাণির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি'
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী,—
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি।
গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে!
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনী ঊষা ঘুম টুটি ঐ হাসে!

সিন্ধু

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী
হে অতৃপ্ত ! রহি রহি
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায় ?
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি ?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে উর্ধ্বে নীলা নিম্নে বেলা-ভূমি !
কথা কও, হে দুরন্ত, বল,
তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল ?
কিসের এ অশ্রান্ত গর্জন ?
দিবা নাই রাত্রি নাই, অনন্ত ক্রন্দন
থামিল না, বন্ধু, তব।
কোথা তব ব্যথা বাজে ! মোরে কও, কা'রে নাহি কব !
কা'রে তুমি হারালে কখন্ ?
কোন্ মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন ?
কে সে বালা ? কোথা তার ঘর ?
কবে দেখেছিলে তারে ? কেন হ'ল পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো !
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো ?
অভিমান করেছে সে ?
মানিনী ঝেপেছে মুখ নিশীথিনী-কেশে ?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে ?
চাঁদের চাঁদিনী বুঝি তাই এত টানে
তোমার সাগর-প্রাণ, জাগায় জোয়ার ?
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার ?

বল' বন্ধু বল',
ওকি গান ? ওকি কাঁদা ? ঐ মত্ত জল-ছলছল—
ওকি হুহুঙ্কার ?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার ?
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল ?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ওকি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ওকি রাগ ? ওকি অনুরাগ ?
জাননা কি, তাই
তরঙ্গে আছাড়ি মর আক্রোশে বৃথাই ?
মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ ।
অশান্ত ! প্রশান্ত ছিলে ।
এ নিখিলে
জানিতে না আপনারে ছাড়া ।
তরঙ্গ ছিলনা বুকে, তখনো দোলানী এসে দেয়নিক নাড়া ।
বিপুল আরসী সম ছিলে স্বচ্ছ ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর ।—
তপস্বী ! ধেয়ানী !
তারপর চাঁদ-এলো—কবে, নাহি জানি
তুমি যেন উঠিলে শিহরি'
হে মৌনী, কহিলে কথা—"মরি মরি
সুন্দর সুন্দর !"
"সুন্দর সুন্দর" গাহি জাগিয়া উঠিল চরাচর !
সেই সে আদিম শব্দ সেই আদি কথা,
সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা ।

সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দু'জন !
কোথা সে উঠিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে ?
সে কথা জানেনা কেউ, জানিবে না, চিরকাল নাহি-জানা র'বে !
এত দিনে ভার হ'ল আপনারে নিয়া একা থাকা,
কেন যেন মনে হয়—ফাঁকা সব ফাঁকা !
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কী নাই,
যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই !

জাগিল আনন্দ-ব্যথা, জাগিল জোয়ার,
লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি !
কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি !
বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হুতাশ্বাস,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা-উছাস ।
বিস্ময়ে বাহিরি এল নব নব নক্ষত্রের দল,
রোমাঞ্চিত হ'ল ধরা,
বুক চিরে এল তার তৃণ-ফুল-ফল ।
এলো আলো, এল বায়ু, এল তেজ প্রাণ,
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সেকি
অভিনব গান !
একি মাতামাতি ওগো একি উতরোল !
এত বুক ছিল হেথা ছিল এত কোল !

শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা,
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা !

জলে জলে ঢলাঢলি চলমান বেগে,
ফুলে ফুলে চুমোচুমি—চরাচরে বলা ওঠে জেগে!
আনন্দ-বিহ্বল
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল!

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিলে জাগি, ব্যথা ক'রে উঠিল ও-বুক।
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গ'লে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা!
নিয়া নেশা, নিয়া ব্যথা সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ!
কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হ'ল তব স্বচ্ছ কায়া!

সিন্ধু ওগো বন্ধু মোর!
গর্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত হুহুঙ্কারে!
বারে বারে
বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, ঊর্ধ্বে প্রিয়া স্থির!

ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল!

কাঁদে গ্রীষ্ম, কাঁদে বর্ষা, বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত
নিখিল বিরহী কাঁদে সিন্ধু তব সাথে,
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে !
সেই অশ্রু—সেই লোনা জল
তব চক্ষে—হে বিরহী বন্ধু মোর—করে টলমল !

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া ।

দুর্বার যৌবন

ওরে অশান্ত দুর্বার যৌবন !
পরাল কে তোরে জ্ঞানের মুখোস, সংযম-আবরণ ?
ভিতরের ভীতি ঢাকিতে রে যত নীতি-বিলাসীরা ছলে
উদ্ধত যৌবন-শক্তিরে সংযত হ'তে বলে।
ওরে দুরন্ত ! উড়ন্ত তোর পাখা কে বাঁধিল বল্ ?
দীপ্ত জ্যোতির্শিখায় ঢাকিল শীর্ণ জরাঞ্চল ?
ওরে নির্ভীক ! ভিখ্-মাগা যত পঙ্গুর দলে ভিড়ে—
আঁধার নিঙাড়ি' আলো আনিত যে—সে রহিল বাঁধা নীড়ে !
যাহাদের মেরুদণ্ডে লেগেছে মেরুর হিমেল্ হাওয়া
যাহাদের প্রাণ শক্তি-বিহীন কঠিন তুহিনে ছাওয়া
তাদের হুকুমে প্রাণের বিপুল বন্যা রাখিলি রু'খে ?
মরুর সিংহ মা'র খায় আজ পিঞ্জর-গৃহে ঢু'কে !

সৃষ্টির কথা ভাবে যারা আগে সংহারে করে ভয়,
যুগে যুগে সংহারের আঘাতে তাদের হয়েছে লয়।
কাঠ না পুড়ায়ে আগুন জ্বালাবে বলে কোন্ অজ্ঞান ?
বনস্পতির ছায়া পাবে বীজ নাহি দিলে তা'র প্রাণ ?
প্রাণ-প্রবাহের প্রবল-বন্যা বেগে খর-স্রোতা নদী
ভেঙেছে দুকূল, সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি।
জলধির মহা-তৃষ্ণা জাগিছে যে বিপুল নদী-স্রোতে,
সে কি দেখে, তা'র স্রোতে কে ডুবিল, কে মরিল তা'র পথে ?
মানে না বারণ, ভরা যৌবন-শক্তি-প্রবাহ ধায়
আনন্দ তার মরণ-ছন্দে কূলে কূলে উথলায় !

জানে না সে ঘর আত্মীয় পর, চলাই ধর্ম, তার
দেখে না তাহার প্রাণ তরঙ্গে ডুবিল তরণী কা'র !
বণিকের দুটো জাহাজ ডুবিবে, তা ব'লে সিন্ধু-ঢেউ
শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে—শুনিয়াছ কভু কেউ ?
ঐরাবত কি চলিবে না, পথে পিপীলিকা মরে ব'লে ?
ঘর পুড়ে ব'লে প্রবল বহ্নি-শিখা উঠিবে না জ্ব'লে ?
অঙ্ক কশে না, হিসাব করে না, বেহিসাবী যৌবন,
ভাঙা চাল দে'খে নামিবে না কি রে শ্রাবণের বর্ষণ ?
তরু ভেঙে পড়ে তাই ব'লে ঝড় আসিবে না বৈশাখী ?
ভীরু মেষ-শিশু ভয় পায় ব'লে রবে না ঈগল পাখী ?

জাগো দুর্মদ যৌবন ! এসো, তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দ'লে চ'লে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।
বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণ-খোলা হাসি,
স্বাধীনতা পরে হবে—আগে গাও "তাজা ব-তাজা"র বাঁশী !
বসিয়াছে যৌবন-রাজপাটে শ্রীহীন অকাল জরা,
মৃত্যুর বহু পূর্বে এ-জাতি হয়ে আছে যেন মরা !
খোলো অর্গল পাষাণের, খুশী বহুক অনর্গল,
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন ওড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, ওঠ দূর গিরি-চূড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে !
ভোলো বাহিরের ভিতরের যত বদ্ধ সংস্কার,
মরিচা ধরিয়া প'ড়ে আছ সব আলির জুল্‌ফিকার !

আর কতদিন ?

আমার দিলের নীল-মহলায় আর কতদিন, সাকী,
শারাব পিয়ায়ে জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম্ আসিবে নাকি ?
অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা পর্দা পানে,
গ্রহতারা মোর সেহেলিরা নিশি জাগে তার সন্ধানে।
চাঁদের চেরাগ ক্ষয় হয়ে এল ভোরের দর-দালানে,
পাতার জাফ্‌রি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে গুলিস্তানে।
রবাবের সুরে অভাব তাঁহার বৃথাই ভুলিতে চাই,
মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে 'আশ্‌নাই'।
শিরাজী পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দেশা।

আমি ছিনু পথ-ভিখারিণী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে ?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্‌বীর,
'তস্‌বী'তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখি-নীর !
"তশবীহি" রূপ এই যদি তাঁর, "তন্‌জিহি" কিবা হয়,
নামে যাঁর এত মধু ঝরে, তাঁর রূপ কত মধুময় !
কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খু'লে
মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতিঃ দুলে উঠে কুতূহলে।

ঘুম-নাহি-আসা নিঝ্‌ঝুম নিশি-পবনের নিশ্বাসে
ফির্‌দৌস-আলা হ'তে লালা ফুলের সুরভি আসে।
চামেলি যূঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভ'রে।

শিষ দেয় দধিয়াল বুল্‌বুলি, চমকিয়া উঠি আমি,
ইঙ্গিতে বুঝি কামিনী-কুঞ্জে ডাকিলেন মোর স্বামী!
নহরের পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রু-জলে,
তসবীর তাঁর জড়াইয়া ধরি বক্ষের অঞ্চলে।
সাকী গো! শারাব দাও, যদি মোর খারাব করিলে দীন,
"আল-ওহুদের" পিয়ালার দৌর্ চলুক বিরাম-হীন।
গেল জাতি কুল শরম ভরম যদি এসে এই পথে
চালাও শিরাজী, যেন নাহি জাগি আর এ বে-খুদী হ'তে
দূর গিরি হ'তে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ-ই-তুর ধারী?
আমারি মত কি ওরি ডাকে মুসা হ'ল মরু পথচারী?
উহারি পরম রূপ দে'খে ঈসা হ'ল না কি সংসারী?
মদিনা-মোহন আহমদ্ ওরি লাগি' কি চির-ভিখারী?
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হ'ল যাহার কাবা দেউলে,
কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি' কালি দিল কুলে,
কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে, সাকী, মোরে মজাইলি,
প্রেম-নহরের কওসর ব'লে আমারে জহর দিলি?

জান সাকি, কা'ল মাটীর পৃথিবী এসেছিল মোর কাছে,
আমি শুধালাম, মোর প্রিয়তম, সে কি পৃথিবীতে আছে?
'খাক' বলিল, না, জানিনা ত আমি, 'আব' বুঝি তাহা জানে,
জলেরে পুছিনু, তুমি কি দেখেছ মোর বঁধূ কোন্‌খানে?

আমার বুকের তস্‌বীর দেখে জল করে টলমল,
জল বলে, আমি এরি লাগি কাঁদি গলিয়া হয়েছি জল !
আগুন হয়ত তেজ দিয়া এরে বক্ষে রেখেছে ঘিরে,
সূর্যের ঘরে প্রবেশিনু আমি তেজ-আবরণ ছিঁড়ে।
হেরিনু সূর্য সাত-ঘোড়া নিয়ে সাত আসমানে ছুটে,
সহসা বঁধূর তস্‌বীর হেরে আমার বক্ষ-পুটে !
বলিল, কোথায় দেখেছ ইহারে, হইয়াছে পরিচয় ?
ইহারই প্রেমের আগুনে জ্বলিয়া তনু হ'ল মোর ক্ষয়।
যুগযুগান্ত গেল কত তবু মিটিলনা এই জ্বালা
ইহারই প্রেমের জ্বালা মোর বুকে জ্বলে হয়ে তেজোমালা।

যেতে যেতে পথে দেখিনু বাতাস দীরঘ নিশা'স ফেলি'
খুঁজিতেছে কা'রে আকাশ জুড়িয়া নীল অঞ্চল মেলি'।
মোর বুকে দেখে তস্‌বীর এল ছুটিয়া ঝড়ের বেগে,
বলে—অনন্ত কাল ছুটে ফিরি দিকে দিকে এরি লেগে।
খুঁজিয়া স্থূল সূক্ষ্ম জগতে পাইনি ইহার দিশা
তুমি কোথা পেলে আমার প্রিয়ের এই তস্‌বীর-শিশা ?
হাসিয়া, উঠিনু ব্যোম-পথে, সেথা কেবল শব্দ ওঠে
অলখ-বাণীর পারাবারে যেন শত শতদল ফোটে।
আমি কহিলাম, দেখেছ ইহারে হে অলক্ষ্য বাণী ?
বাণীর সাগরে কত অনন্ত হ'ল যেন কানাকানি !
"নাহি জানি নাহি জানি" ব'লে ওঠে অনন্ত ক্রন্দন,
বলে, হে বন্ধু, জানিলে টুটিত বাণীর এ বন্ধন !
জ্যোতির মোতির মালা গলে দিয়া সহসা স্বর্ণরথে
কে যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পলাল অলখ-পথে।

‘ও কি জৈতুনী রওগন, ওরই পারে জলপাই-বনে
আমার পরম-একাকী বন্ধু খেলে কি গো নিরজনে ?’
শুধানু তাহারে ; নিষ্ঠুর মোর দিলনাক উত্তর।
জাগিয়া দেখিনু, অঙ্গ আবেশে কাঁপিতেছে থরথর !

জোহরা সেতারা উঠেছে কি পূবে ? জেগে উঠেছে কি পাখী ?
সুরার্ সুরাহি ভেঙে ফেল সাকী, আর নিশি নাই বাকী।
আসিবে এবার আমার পরম বন্ধুর বোর্‌রাক
ঐ শোনো পূব-তোরণে তাহার রঙীন নীরব ডাক !

আজাদ

কোথা সে আজাদ ? কোথা সে পূর্ণ-মুক্ত মুসলমান ?
আল্লাহ্ ছাড়া করেনা কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ ?
কোথা সে 'আরিফ', কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর ?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি' কাঁদে ত্রিভুবন থরথর !
কে পিয়েছে সে তৌহীদ-সুধা পরমামৃত হায় ?
যাহারে হেরিয়া পরাণ পরম শান্তিতে ডুবে যায় !
আছে সেই কোরান্-মজীদ আজিও পরম শক্তিভরা,
ওরে দুর্ভাগা, এককণা তার পেয়েছিস্ কেউ তোরা ?
সেই যে নামাজ রোজা আছে আজো, আজো সে কল্মা আছে,
আজো উথলায় আব-জম্জম কাবা-শরীফের কাছে।
নামাজ পড়িয়া, রোজা রেখে আর কল্মা পড়িয়া সবে
কেন হ'তেছিস্ দলে দলে তোরা কতল্-গাহেতে জবেহ্ ?
সব আছে, তবু শবের মতন ভাগাড়ে পড়িয়া কেন ?
ভেবেছ কি কেউ কৌমের পীর, নেতা ; কেন হয় হেন ?
আজিও তেমনি জামায়েত হয় ঈদ্গাহে মস্জিদে,
ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি ঢু'লে আসে নিঁদে !
যেন দলে দলে কলের পুতুল, শক্তি শৌর্যহীন,
নাহিক ইমান, বলিতে হইবে—ইহারা মুস্লেমিন !

পরম পূর্ণ শক্তি-উৎস হইতে জনম লয়ে
কেমন করিয়া শক্তি হারাল এ জাতি ? কোন্ সে ভয়ে
তিলে তিলে মরে, মানুষের মত মরিতে পারেনা তবু ?
আল্লাহ্ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু !

খুঁজিয়া দেখিনু, মুসলিম নাই, কেবল কাফেরে ভরা,—
কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতিজরা।
অজ্ঞান-অন্ধকার যাহারে রেখেছে আবৃত করি',
নিত্য সূর্য জ্বলে, তবু যার পোহালনা বিভাবরী !
আল্লাহ্ আর তাহার মাঝারে কোনো আবরণ নাই,
এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই—দেখেছ তাহারে ভাই ?
আল্লার সাথে নিত্য-যুক্ত পরম শক্তিধর,
এই মুসলিম-কবরস্তানে পেয়েছ তার খবর ?
চায়নাক যশ, চায়নাক মান, নিত্য নিরভিমান,
নিরহঙ্কার আসক্তি-হীন—সত্য যাহার প্রাণ ;
জমায়না যে বিত্ত নিত্য মুসাফির গৃহহীন,
আসমান যার ছত্র ধরেছে, পাদুকা যার জমীন ;
দিনে আর রাতে চেরাগ যাহার চন্দ্র সূর্য তারা,
আহার যাহার আল্লার নাম—প্রেমের অশ্রু-ধারা ?

✓ যার পানে চায়—সেই যেন পায় তখনি অমৃত বারি,
যারে ডাকে—সে অমনি তাহার সাথে চলে সব ছাড়ি ?
অনন্ত জন-গণ মাঝে পারে শক্তি সঞ্চারিতে,
যারে স্পর্শ করে সে অমনি ভ'রে ওঠে অমৃতে।
সেই সে পূর্ণ মুসলমান সে পূর্ণ শক্তিধর,
'উম্মি' হয়েও জয় করিতে সে পারে এই চরাচর !
যে দিকে তাকাই দেখি যে কেবলি অন্ধ বদ্ধ জীব,
ভোগোন্মত্ত, পঙ্গু, খঞ্জ, আতুর, বদ-নসীব।
কাগজে লিখিয়া, সভায় কাঁদিয়া গুম্ফ শ্মশ্রু ছিঁড়ে,
আছে কেউ নেতা, লবে ইহাদের অমৃত-সাগর-তীরে
আসে অনন্ত শক্তি নিয়ত যে মূল-শক্তি হ'তে
সেখান হইতে শক্তি আনিয়া ভাসাতে শক্তি-স্রোতে—

কোন্ তপস্বী করিছে সাধনা ? বন্ধু, বৃথা এ শ্রম,
নিজে যার ভ্রম ভাঙেনি সেই কি ভাঙাবে জাতির ভ্রম ?
দোজখের পথে, ধ্বংসের পথে চলিয়াছে সারা জাতি,
শূন্য দু হাত 'পাইয়াছি' ব'লে তবু করে মাতামাতি !

সেদিন এমনি মাতালের সাথে পথে মোর হ'ল দেখা,
শুধানু. "কি পেলে ?" সে বলে, "দেখনা, কপালে রয়েছে লেখা !"
কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
বাদ্‌শাহ্ হ'তে পারিত যে হায়, পেয়েছে সে জমিদারী !

দলে দলে আসে, কারও বুকে, কারও পেটে, কারও হাতে লেখা,
আজাদীর চিন্—অর্থাৎ কিনা চাকুরীর মসী-লেখা !
কাঁদিয়া কহিনু,—ওরে বে-নসীব, হতভাগ্যের দল,
মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল ?

অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজে দাস হ'তে, ওরে
আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন ক'রে ?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ ?

হে চির-অরুণ তরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারনি আজো
ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিন্ধবাদের বাহন সাজো ?
জরারে পৃষ্ঠে বহিয়া বহিয়া জীবন যাবে কি তব,
জীবন ভরিয়া রোজা রাখি' ঈদ আনিবে না অভিনব ?

ঘরে ঘরে তব লাঞ্ছিত মাতা ভগ্নিরা চেয়ে আছে,
ওদের লজ্জা-বারণ শক্তি আছে তোমাদেরই কাছে ।
ঘরে ঘরে মরে কচি ছেলে মেয়ে দুধ নাহি পেয়ে হায়,
তোমরা তাদেরে বাঁচাবে না আজ বিলাইয়া আপনায় ?

আজ মুখ ফুটে, দল বেঁধে বল, বল ধনীদের কাছে,
ওদের বিত্তে এই দরিদ্র দীনের হিস্‌সা আছে !

ক্ষুধার অন্নে নাই অধিকার ; সঞ্চিত যার রয়
সেই সম্পদে ক্ষুধিতের অধিকার আছে নিশ্চয় !

মানুষেরে দিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার
ইস্‌লাম এসেছিল দুনিয়ায়, যারা কোরবান তার—
তাদেরই আজ আসিয়াছে ডাক—বেহেশত্ পার হ'তে,
আনন্দ লুট হবে দুনিয়ায় মহা-ধ্বংসের পথে—
প্রস্তুত হও—আসিছেন তিনি অভয় শক্তি লয়ে—
আল্লাহ্ থেকে আবে-কওসর নবীন বার্তা বয়ে।
অন্তরে আর বাহিরে নিত্য আজাদ মুক্ত যারা—
নব-জেহাদের নির্ভীক দুর্বার সেনা হবে তারা,
আমাদেরই আনা নিয়ামত্ পেয়ে খাবে আর দেবে গালি,
জেহাদের রণে নওশা সাজিয়া মোরা দিব হাত-তালি !
বলিল বন্ধু, মিটেছে কি ক্ষুধা, পেয়েছ কি কওসর ?
বেহেশ তে হবে তকবীর-ধ্বনি, আল্লাহু আকবর !
জিন্নাৎ হ'তে দেখিব মোদের গোরস্তানের পর
প্রেমে আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নূতন ঘর !

পরিশিষ্ট

নজরুল জীবন-পঞ্জী

১৩০৬, ১১ই জ্যৈষ্ঠ....	কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
১৩১৪, ৭ই চৈত্র....	নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহ্‌মদের মৃত্যু হয়।
১৩১৬....	গ্রামের মক্তব থেকে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন।
১৩১৭....	আসানসোলে পালিয়ে যান ও সেখানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে এক রুটির দোকানে কাজ করেন।
১৩১৯....	ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি হন।
১৩২০....	রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হন। কথাশিল্পী শৈলজানন্দ এ-সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন।
১৩২৩ (১৯১৭ খ্রীঃ)....	নজরুল প্রি-টেষ্ট পরীক্ষা দিয়েই ৪৯নং বাঙ্গালী পল্টনে নাম লেখান এবং করাচী চলে যান।
১৩২৬, জ্যৈষ্ঠ....	মাসিক সওগাতে (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়) নজরুলের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাটির নাম 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী।'
১৩২৬, শ্রাবণ....	নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৩২৬, পৌষ....	'প্রবাসী' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় 'হাবিলদার' নজরুলের ('আশায়' নামক) একটি ছোট কবিতা ছাপা হয়। কবিতাটি হাফিজের অনুবাদ।
১৩২৬....	এ-বছরের শেষদিকে নজরুল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
১৩২৭, বৈশাখ....	'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রথম (বৈশাখ) সংখ্যা থেকে তাঁর ধারাবাহিক পত্রোপন্যাস 'বাঁধন হারা' প্রকাশিত হতে থাকে।
১৩২৮, কার্তিক....	কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল পাশা' বেরোয়।
১৩২৯....	নজরুলের অর্ধসাপ্তাহিক পত্র 'ধূমকেতু'র প্রকাশ (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অগাষ্ট)। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নলিখিত আশীর্বাণী প্রকাশিত হয়।

"আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,

দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন,

অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,

জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।"

নজরুলের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়।

	‘ধূমকেতুতে’ ‘আগমনী’ নামক কবিতা প্রকাশের দরুণ তিনি রাজরোষে পতিত হন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।
১৩৩০, আশ্বিন....	নজরুলের ‘দোলন চাঁপা’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
১৩৩১, বৈশাখ....	নজরুল আশালতা সেনগুপ্তাকে বিয়ে করেন।
১৩৩১, শ্রাবণ....	নজরুলের ‘ভাঙ্গার গান’ প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।
১৩৩২, ১লা পৌষ....	নজরুলের পরিচালনায় সাপ্তাহিক ‘লাঙল’ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ।
১৩৩৩, মাঘ....	ঢাকায় ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে নজরুল অন্যতম অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে তিনি স্বরচিত কবিতা (‘খালেদ’) আবৃত্তি দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।
১৩৩৪....	নজরুল ঢাকায় ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।
১৩৩৪, শ্রাবণ....	নজরুলের ‘ফণি-মনসা’ প্রকাশিত হয়।
১৩৩৫, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ....	নজরুলের আম্মা জাহেদা খাতুন এন্তেকাল করেন।
১৩৩৬, ২৯শে অগ্রহায়ণ....	কলকাতা এলবার্ট হলে নজরুল ইসলামকে জাতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।
১৩৩৭, আষাঢ়....	নজরুলের অনুবাদ-গ্রন্থ রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ প্রকাশিত হয়।

১৩৩৯, ভাদ্র....	নজরুলের 'জুলফিকার' প্রকাশিত হয়।
১৩৩৯ আশ্বিন...	নজরুলের 'বনগীতি' নামক গানের বই প্রকাশিত হয়।
১৩৪০....	'কাব্য-আমপারা' প্রকাশিত হয়।
১৩৪৯ (১৯৪২)....	নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তথাপি ১৩৫২ সাল পর্যন্ত তিনি কাব্য-সাধনা করতে পেরেছিলেন।
.৩৫২....	কবি সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতাগুলার সঙ্কলন 'নতুন চাঁদ' আত্মপ্রকাশ করে। এই কাব্যটিকে নজরুলের শেষ রচনা বলা যেতে পারে।
১৩৫৭....	নজরুলের শেষ পুস্তক 'মরু-ভাস্কর' প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর জীবনী অবলম্বনে একটি অসম্পূর্ণ কাব্য। জানা যায় যে, কবির এই বইটি বেশ কয়েক বৎসর আগের রচনা।

গ্রন্থ-পঞ্জী

১। **অগ্নিবীণা** (কবিতা) ১৩২৯ সাল।

স্থচী—প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, কামাল পাশা, আনোয়ার, রণভেরী, শাত্-ইল-আরব, খেয়া পারের তরণী, কোরবাণী ও মোহর্‌রম্।

২। **ব্যথার দান** (গল্প) ১৩২৯ সাল।

স্থচী—ব্যথার দান, হেনা, বাদল বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, অতৃপ্ত কামনা ও রাজবন্দীর চিঠি।

৩। **দোলন চাঁপা** (কবিতা) আশ্বিন, ১৩৩০ সাল।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন।

স্থচী—দোদুল দুল, বেলা শেষে, পউষ, পথহারা, ব্যথা গরব, উপেক্ষিত, সমর্পণ, পূবের চাতক, অবেলার ডাক, চপল সাথী, পূজারিণী, অভিশাপ, আশান্বিত', পিছু ডাক, মুখরা, সাধের ভিখারিণী, কবি-রাণী, আশা ও শেষ প্রার্থনা।

৪। **যুগবাণী** (প্রবন্ধ)।

বইটি তদানীন্তন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

৫। **রুদ্র মঙ্গল** (প্রবন্ধ)।

৬। **দুর্দিনের যাত্রী** (প্রবন্ধ)।

৭। **ভাঙ্গার গান** (গান)—শ্রাবণ, ১৩৩১।

স্থচী—ভাঙ্গার গান, জাগরণী, মিলন গান, পূর্ণ-অভিনন্দন, ঝোড়ো গান, মোহান্তের মোহ-অন্তের গান, আশুপ্রয়াণ গীতি, দুঃশাসনের রক্তপান, ল্যাবেণ্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত, সুপার (জেলের) বন্দনা ও শহিদী ঈদ।

৮। **বিষের বাঁশী** (কবিতা ও গান) শ্রাবণ, ১৩৩১।

সূচী—ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম (আবির্ভাব ও তিরোভাব) সেবক, জাগৃহি, তূর্য-নিনাদ, বোধন, উদ্বোধন, অভয়-মন্ত্র, আত্মশক্তি, মরণ-বরণ, বন্দী বন্দনা, বন্দনা গান, মুক্তি-সেবকের গান, শিকল পরার গান, মুক্তবন্দী, যুগান্তরের গান, চরকার গান, জাতের বজ্জাতি, সত্যমন্ত্র, বিজয়-গান, পাগল পথিক, ভূত-ভাগানোর গান, বিদ্রোহীর বাণী, অভিশাপ, মুক্ত-পিঞ্জর ও ঝড়।

৯। **রিক্তের বেদন** (গল্প)।

সূচী—রিক্তের বেদন, বাঊণ্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহের-নেগার, সাঁজের বাতি, রাক্ষুসী, সালেক, স্বামীহারা ও দুরন্ত পথিক।

১০। **চিত্তনামা** (কবিতা)।

১১। **পূবের হাওয়া** (কবিতা)—আশ্বিন, ১৩৩২।

সূচী—মরমী, স্মরণে, অবসর, নিকটে, মানিনী, আশা, বেদনা-মাণিক, বেদনহারা, নিরুদ্দেশ যাত্রী, পথিক শিশু, স্নেহ-ঋণী, হোলি, বেশরম্, সোহাগ, শরাবন তহুরা, দুপুর অভিসার, দহন মালা, পথিক বধূ, স্নেহ পরশ, বাঁশী বাজিল, গৃহহারা, অনাদৃতা, স্নেহাতুর, বিরহ-বিধুরা, নিশীথ-প্রীতম্, রেশমী ডোর, দূরের পথিক, প্রণয় নিবেদন, ফুল-কুঁড়ি, পুলক, প্রণয় ছল, বরষায়, বিদায় বাঁশী, শেষের ডাক, অভিমানিনী, শেষের প্রীতম্ ও বিজয়িনী।

১২। **ছায়ানট** (কবিতা)—১৩৩১ সাল।

১৩। **সাম্যবাদী** (কবিতা) ১৩৩২ সাল।

১৪। **রাজবন্দীর জবানবন্দী**।

১৫। **ঝিঙেফুল** (ছোটদের জন্য কবিতা)

১৬। **সর্বহারা** (কবিতা) ১৩৩৩ সাল।

১৭। **সিন্ধু-হিন্দোল** (কবিতা) ১৩৩৪।

স্থচী—সিন্ধু (প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব), গোপন প্রিয়া, অনামিকা, বিদায় স্মরণে, পথের স্মৃতি, উন্মনা, অতল পথের যাত্রী, দারিদ্র্য, বাসন্তী, ফাল্গুনী, মঙ্গলাচরণ, বধূবরণ, অভিযান, রাখীবন্ধন, চাঁদনী রাতে, মাধবী প্রলাপ ও দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর।

১৮। **ফণি-মনসা** (কবিতা) শ্রাবণ, ১৩৩৪।

১৯। **জিঞ্জীর** (কবিতা) ১৩৩৫।

স্থচী—বার্ষিক সওগাত, অঘ্রানের সওগাত, মিসেস এম, রহমান, নকীব, খালেদ, সুবহ্‌-উম্মেদ, খোশ আম্‌দেদ, নওরোজ, ভীরু, অগ্রপথিক, ঈদ মোবারক, আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়, চিরঞ্জীব জগলুল, আমানুল্লাহ্‌, উমর ফারুক ও এ-মোর-অহঙ্কার।

২০। **সঞ্চিতা** (নজরুলের কাব্য-সংগ্রহ)

একই বছরে একই সঙ্গে 'সঞ্চিতা'র দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্মন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত সঞ্চিতায়—অগ্নিবীণা, ঝিঙ্গেফুল, সর্বহারা, ফণিমনসা, ছায়ানট, দোলন চাঁপা, সিন্ধু-হিন্দোল ও চিত্তনামা থেকে কবিতা সংগৃহীত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৩৪ এবং প্রকাশের তারিখ ২রা অক্টোবর, ১৯২৮। ডি, এম, লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত সঞ্চিতায়, অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, সর্বহারা, ফণিমনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, চিত্ত-নামা, ঝিঙ্গেফুল, বুলবুল ও জিঞ্জীর থেকে কবিতা সংগৃহীত হয়েছিল। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২২৩ এবং প্রকাশের তারিখ ১৪ই অক্টোবর, ১৯২৮।

২১। **বাঁধনহারা** (পত্রোপন্যাস)।

২২। **বুলবুল** (গান) ১৩৩৫।

২৩। **চক্রবাক** (কবিতা) ১৩৩৬।

সূচী—তোমারে পড়িছে মনে, বাদল-রাতের পাখী, স্তব্ধ রাতে, বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি, কর্ণফুলী, শীতের সিন্ধু, পথচারী, মিলন-মোহানায়, গানের আড়ালে, ভীরু, এ মোর অহঙ্কার, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, হিংসাতুর, বর্ষা-বিদায়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে, অপরাধ শুধু মনে থাক, আড়াল, নদীপারের মেয়ে, ১৪০০ সাল, চক্রবাক ও কুহেলিকা।

২৪। **সন্ধ্যা** (কবিতা) ১৩৩৬।

সূচী—তরুণ তাপস, আমি গাই তারি গান, জীবন-বন্দনা, ভোরের পাখী, কাল-বৈশাখী, নগদ কথা, জাগরণ, জীবন, যৌবন, তরুণের গান, চল্ চল্ চল্, ভোরের সানাই, যৌবন-জল-তরঙ্গ, রীফ সর্দার, বাংলার আজীজ, সুরের দুলাল, নিশিথ অন্ধকারে, শরৎচন্দ্র, অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, পাথেয় দাড়ি-বিলাপ, তর্পণ না-আসা-দিনের কবির প্রতি।

২৫। **চোখের চাতক** (কবিতা ও গান)।

২৬। **কুহেলিকা** (উপন্যাস) জুলাই,১৯৩১।

২৭। **মৃত্যুক্ষুধা** (উপন্যাস)।

২৮। **শিউলিমালা** (গল্প) অক্টোবর,১৯৩১।

চারটি ছোটগল্পের সমষ্টি। সর্বশেষ গল্পের নামে গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে।

২৯। **চন্দ্রবিন্দু** (গান)।

এতে ৪৩ টি গান ও অতিরিক্ত ১৮ টি কমিক-গান স্থান পেয়েছে।

৩০। **প্রলয়শিখা** (কবিতা)।

'প্রলয়শিখা' ও 'চন্দ্রবিন্দু' ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

৩১। **রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ** (অনুবাদ) আষাঢ়, ১৩৩৭।

৩২। **নজরুল গীতিকা** (গান) ভাদ্র, ১৩৩৭।

৩৩। **পুতুলের বিয়ে** (ছোটদের জন্য—নাটক ও কবিতা)

সূচী—পুতুলের বিয়ে, কালো জামরে ভাই, জুজুবুড়ীর ভয়, কে কি হবি বল, ছিনিমিনি খেলা, কানামাছি, নবাব নামতা পাঠ সাত ভাই চম্পা ও শিশু যাদুকর।

৩৪। **সাত ভাই চম্পা** (কবিতা)।

৩৫। **আলেয়া** (গীতি-নাট্য) ১৩৩৮।

গল্পাংশ—গান্ধারের রাজা এবং যশল্মীরের স্বাধিকারপ্রমত্তা রাণী একে-অন্যের প্রতি হৃদয়াবেগগত আকর্ষণ অনুভব করেন এবং একে-অন্যের হৃদয়ে অধিকার প্রতিষ্টার মানসে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যুদ্ধের পর মিলনের লগ্ন যখন সন্নিকটবর্তী হয় তখন রাণী রাজার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেন।

গ্রন্থ মুদ্রিত হবার পূর্বেই সম্ভবত পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে ১৩৩৬ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'কল্লোল'এর সাহিত্য সংবাদে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়—"নজরুল ইসলাম একখানি অপেরা লিখেছেন। প্রথমে তার নাম দিয়েছিলেন 'মরু-তৃষা'। সম্প্রতি তার নাম বদলে 'আলেয়া' নামকরণ হয়েছে। গীতিনাট্যখানি সম্ভবত মনোমোহনে অভিনীত হবে। এতে গান আছে ৩০ খানি। নাচে গানে অপরূপ হয়েই আশা করি এ অপেরাখানি জনসাধারণের মন হরণ করবে।"

৩৬। **ঝিলিমিলি** (নাটক) নভেম্বর, ১৯৩০।

সূচী—ঝিলিমিলি, সেতু-বন্ধ, শিল্পী ও ভূতের ভয়।

৩৭। **নজরুল স্বরলিপি** (স্বরলিপি)

৩৮। **জুলফিকার** (গান) ভাদ্র, ১৩৩৯।

৩৯। **বনগীতি** (গান) আশ্বিন, ১৩৩৯।

৪০। **কাব্যে আমপারা** (অনুবাদ) ১৩৪০।

৪১। **সুরলিপি** (স্বরলিপি) অগাষ্ট,১৯৩৪।

৪২। **সুরমুকুর** (স্বরলিপি) ১৩৪১,অক্টোবর,১৯৩৪।

৪৩। **গানের মালা** (গান) অক্টোবর,১৯৩৪।

৪৪। **সুর-সাকি** (গান) ১৩৩৮।

৪৫। **ফুলবাগিচা** (গান)

৪৬। **গীতিশতদল** (গান) বৈশাখ, ১৩৪১;

৪৭। **নতুন চাঁদ** (কবিতা) চৈত্র, ১৩৫১।

সূচী—নতুন চাঁদ, চির জনমের প্রিয়া, আমার কবিতা তুমি, নিরক্ত, সে যে আমি, অভেদম্. অভয়-সুন্দর, অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলী, কিশোর রবি, কেন জাগাইলি তোরা, দুর্বার যৌবন, আর কতদিন, ওঠ্ রে চাষী, মোবারকবাদ, কৃষকের ঈদ, শিখা ও আজাদ। দ্বিতীয় সংস্করণে অতিরিক্ত দুটি কবিতা সংযোজিত হয়েছে—ঈদেরচাঁদ ও চাঁদনী রাতে।

৪৮। **মরু-ভাস্কর** (কবিতা) ১৩৫৭।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী অবলম্বনে রচিত অসম্পূর্ণ কাব্য। কবি অসুস্থ হওয়ার অনেক পূর্বে এই কাব্য রচনায় হাত দেন, কিন্তু তিনি তা' সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।

৪৯। **নির্ঝর** (কবিতা)

সূচী—অভিমানী, বাঁশীর ব্যথা, আশায়, সুন্দরী, মুক্তি, চিঠি, আরবী ছন্দের কবিতা, প্রিয়ার দেওয়া শরাব, মানিনী বধূর প্রতি, গান, গরীবের ব্যথা, তুমি কি গিয়াছ ভুলে, হবে

জয়, পূজা অভিনব, চাষার গান, জীবনে যাহারা বাঁচিল না, দীওয়ান-ই-হাফিজ (আটটি) ও নমস্কার।

নাম-পৃষ্ঠা বাদে সম্পূর্ণ বইটি অনেক দিন আগেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থ হিসাবে 'নির্ঝর' কোনও দিন বাজারে বের হয়নি। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মুক্তি' কবিতাটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা। ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় কবিতাটি মুদ্রিত হয়। 'আশায়' ও 'বাঁশীর ব্যথা' যথাক্রমে হাফিজ ও রুমীর কবিতার ভাবানুবাদ। 'আশায়' কবিতাটি ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল। 'নিঝর' এর অন্তর্ভুক্ত দীওয়ান-ই-হাফিজের আটটি গজলের মধ্যে ছয়টি গজল ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩০-এর আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে হাফিজের আর একটি গজল বের হয়। চৈত্র (১৩২৮) সংখ্যা প্রবাসীতে নজরুল ইসলামের আরবী ছন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে আরবী ছন্দের কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি আছে।

নজরুল সম্বর্ধনা

১৩৩৬ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ কলকাতা এলবার্ট হলে নজরুল ইসলামকে জাতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। কবি, অভিনন্দন-পত্রের যে উত্তর দেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

কবির উত্তর

"আমাকে বিদ্রোহী ব'লে খাম্‌খা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতটাকে আঁচ্‌ড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনোদিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, আমারো অনেক আগে থেকে মরণ তাদেরে তাড়া ক'রে নিয়ে ফিরছে! আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

একথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই, যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠ্‌তে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র—Beauty is Truth, Truth Beauty. আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে,--কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি; আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি-শিরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি! যেন মরু-পথে পথ না হারাই!—এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি। এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে, বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ, প্রখরদশন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং

তাদের নখর-দশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে-অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজ্‌বে, ও-উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আস্‌বে তার পূর্ব-পরিচয় নিয়ে। নব বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁদের মত হলুম না ব'লে—তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের ক'রে দেখেন।

আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি ব'লেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল কালের, সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব-গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পেরেছি ব'লেই কবি। বনের পাখী নীড়ের উর্ধ্বে উ'ঠে গান করে ব'লে বন তাকে কোনোদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড় করে ব'লে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করুন। আম গাছকে চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠ্যাঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পার্‌বে না। উল্টো ঐ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে!

যৌবনের রক্ত-শিখ মশাল ধ'রে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন কর্‌তে চলেছে যে বর-যাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই ব'লে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না আমিও আছি তাঁদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদদাররূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও

বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যানমূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠ্‌বে, সেদিন আমিও আস্‌ব ঐ মেলায় শাহজাদা খুর্‌রমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপন নিয়ে। আমি শুধু সুন্দরের হাতে বাণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চ'লে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধ কূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।

নজরুলের কয়েকটি-রচনা

—ক—

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি উগালে,
রোজাতে জমি সামলে,
কলেমায় জমিতে মই দিলে,
চিন্তা কিহে এই ভবেতে !

লা-ইলাহা ইল্লিলাতে
বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।

নয়টি নালা আছে তাহার
ওজুর পানি সিয়াত ইহার
ফলে পানি নানা প্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে।

যদি ভাল হয়েছে জমি,
হজ্জ জাকাত লাগাও তুমি,
আর সুখে থাক্‌বে তুমি,
কয় নজরুল ইসলামেতে।

এ-গানটি নজরুলের ১৩/১৫ বছর বয়সে লেখা "চাষার সং' নামক নাটিকা থেকে গৃহীত। এ-গানটি এবং পরবর্তী গানটি ঈদসংখ্যা 'মিল্লাত' (১৩৫৩)-এ ছাপা হয়েছিলো।

—খ—

বুঝলাম নাথ এতদিনে যুবকের ছলনা হে।
কোথা শিখিলে এ প্রণয় আমারে বলনা হে ॥
তোমার হিয়া কঠিন অতি
জান না শ্যাম প্রেমের রীতি
তাই নিভালে প্রণয় বাতি
আর বাতি জ্বেল না হে।

এইরূপে কত কামিনী
মজায়েছেন গুণমনি
কপাল দোষে বিরহিনী
তোমার আর হল না হে।
বিরহ জ্বালায় মরিলাম
আর জ্বালায়োনা বাঁকা-শ্যাম
ভেবে বলে নজরুল ইস্‌লাম
মের না ললনা হে।

এ-গানটিও নজরুলের ছেলেবয়সের রচনা।

—গ—

‘কবিতা সমাধি’

পরিশ্রমে গলদঘর্ম,—সারা নিশি জেগে
ভাবশিরে মুহুর্মুহু লাঠ্যাঘাতি রেগে,
সে কি লেখিলাম মহা মহা পদ্য !
অক্ষর একুন করি যোজিলাম চৌদ্দ !
মৃচ্ছকটিক আর শব্দসার ভ্রমি’
আনিলাম কাব্য এক শব্দকল্পদ্রুমি !
রচিলাম কি বিকট ছন্দ বাছি বাছি,
জাহাজে বেঁধেছে যেন শত শক্ত কাছি !
কবিদের ভাব সব ‘না-বলিয়া-নিয়া’
সাহিত্য আসরে এমু গুম্ফ আস্ফালিয়া !
এ লেখা কি ব্যর্থ হয় ?—তবে নামি মিছে !
“বাঃ ভাই !” বন্ধুরা কয় দন্ত সজ্ব খিঁচে !
চাটুবাক্যে লুব্ধ হ’য়ে কবিতা রাশিকে
পাঠালাম ছোট বড় সকল মাসিকে।
সম্পাদক অভদ্র সে না দেয় উত্তর,
বিষম রুখিয়া শেষে লিখিনু, “দুত্তোর !
টিকিট খেয়েছ মম,—যেতে দাও ;—এবে
হে ভদ্র, কবিতাগুলি ফিরায়ে কি দেবে ?”
শেষে সে সহস্র পত্র লেখার দরুণ
‘রিপ্লাই’ আসিল ওহো, ভীষণ করুণ !
“অবশ্য, কিছুও তা’র পাই যদি ঘেটে—
কবিতা সমাধিপূত পেপার বাস্কেটে” !!!

এ-কবিতাটি নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা। কবিতাটি ১৩২৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা ‘সওগাত’-এ প্রকাশিত হয়।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' ১৩২৬- সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কবিতাটি নজরুলের 'নির্ঝর' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

—ঘ—

'আশায়'

(হাফেজ)

[illegible]

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দুর্বা যেমন যুঁইকুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে,—তেমনি বিভোর থাক্‌রে প্রিয়ার আশায়,
তার অলকের একটু সুবাস পশ্‌বে তোরও নাসায়।
বরষ শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ।

এ-কবিতাটি নজরুলের তৃতীয় প্রকাশিত কবিতা। এটি ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম অনুবাদ কবিতা।

পরিযোজন

যে-কোনো কবিতা-পাঠকের কাছে—ছন্দোগত এ-বৈষম্য সহজেই ধরা পড়বে। রচনাগত শিথিলতার পরিচয় আছে, যেমন—'এই কি নিয়ম ? এই কি নিয়তি ? নিখিল জননা জানে, সৃষ্টির আগে এই সে অসহ প্রসব-ব্যথার মানে।'

নিম্নের চরণ দু'টি নিছক গদ্যাত্মক :

'এমনি আঁধার ঘনতম হ'য়ে
ঘিরিয়া ছিল সেদিন,
উদয় রবির পানে চেয়ে ছিলো
জগৎ তমসালীন।'

অথবা—

'ফারাণের' পর্বত-চূড়া পানে
ভাববাদী বিশ্বের
কর-সঙ্কেতে দিল ইঙ্গিত
ইহারি আগমনের।'

অথবা—

"নসবার দূষিত ছিল বড় বায়ু
মক্কাপুরীর,
নিঃশ্বাসে ছিল বিষের আমেজ
হাওয়ায় সুরীর।
কহিলেন দাদা মুত্তালিব,
"গো হালিমা শুন,
মরু-প্রান্তরে লয়ে যাও মোর
চাঁদেরে পুনঃ!
আবার যেদিন ডাকিব,
আনিবে ফিরায়ে এরে,
মাঝে মাঝে এনে দেখাইয়া যেয়ো
মোর চাঁদেরে!"

উপরের ছ'টি চরণে, বিশেষ ক'রে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে, অমার্জনীয় শিথিলতার পরিচয় আছে। শেষের দিকে ঘটনা-বিন্যাসে বিচ্যুতির পরিচয় আছে। শেষের ক'টি অধ্যায় যে-পরম্পরায় সজ্জিত হয়েছে, তা'তে ঘটনার ক্রমধারা বর্তমান নেই। 'শাদী মোবারক,' 'খদিজা', 'সম্প্রদান', 'নও কাবা'—এভাবে পরপর এ-অধ্যায়গুলি আসতে পারে না। 'খদিজা,' 'সম্প্রদান', 'শাদী-মোবারক' ও সবশেষে 'নও কাবা' অধ্যায়গুলি-এভাবে পারম্পর্য রক্ষা ক'রে পরিকল্পিত হলে ঘটনা-বিন্যাস অর্থপূর্ণ হত। এ ত্রুটি নিছক সম্পাদনার।

প্রকাশের পূর্বে রচনাগত যে পরিমার্জনার প্রয়োজন ছিলো, এ-গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা' সম্ভব হয়নি। আমি এখানে 'মরু-ভাস্কর'-এর উপমা বা রূপকালঙ্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। নজরুল ইসলামের কাব্যে তিন প্রকারের উপমার পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ক্ষেত্রে অতীত ইতিহাস বা পুরাণ, রূপকের উপাদানে পরিণত হয়। কবি বর্তমানের কোন বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বোধকে তীক্ষ্ণতর করবার জন্য অথবা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমাদের নিবেদন-বাণীকে অতিরিক্ত বিনত বা গভীর অর্থজ্ঞাপক করবার জন্য, অতীতের ইতিহাসের বা পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে তাকে উপমিত করেন। কবি-কল্পনায় এহেন অতীত স্থায়ী সম্পদযুক্ত, চিরন্তন আদর্শদীপ্ত। 'ইন্দ্র-পতনে' চিত্তরঞ্জনের প্রশংসাব্যপদেশে বলছেন ঃ

"আজ শুধু জাগে তব অপরূপ
　　　　সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ
　　　　বাণীর কমল বনে!
কখন তোমার বীণা ছেয়ে গেল
　　　　সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন
　　　　তোমার ললাট তলে!

লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি,
বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি
কণ্ঠে গরল দানি,
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা,
যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অসিত তেজ ভাস্কর,
মৃগাঙ্ক দিল হাসি।"

অবশ্য এখানে পৌরাণিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হ'য়েছে যথার্থ রূপক হিসেবে নয়, কিন্তু সুনির্দেশ লক্ষ্য হিসেবে। অতীতের ঘটনা রূপক হিসেবে স্পষ্ট হ'য়েছে নিম্নোদ্ধৃত কাব্য-স্তবকে :

"জয়নাল সম মোরা সবাই
শুইয়া বিমারী খিমার মাঝ,
আফসোস করি কাঁদি শুধু,
দুশমন করে লুটতরাজ !
আব্বাস সম তুমি হে বীর
গেণ্ডুয়া খেলি অরি-শিরে
পঁহুছিলে একা ফোরাত-তীর,
ভ লে মশক প্রাণ-নীরে।"

"মরু ভাস্কর"-এ আছে :

'জুলেখার মত অনুরাগ জাগে
হৃদয়ে কেন,
মনে মনে ভাবে, এই সে তরুণ
য়ুসোফ যেন !

দেখেনি য়ুসোফে, তবু মনে হয়
ইহার চেয়ে
সুন্দরতর ছিলনা সে কভু ।
বেহেশত বেয়ে
সুন্দরতম ফেরেশতা আজ
এসেছে নামি,
এল জীবনের গোধূলি লগনে
জীবন-স্বামী ।"

এ-ধরণের উপমায় কাব্য-কুশলতার সুযোগ বিশেষ নেই। বস্তু অথবা ঘটনার শিল্প-মূল্য নির্ধারণের জন্য অথবা সৌন্দর্য পরিচর্যার জন্য এহেন উপমার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। এগুলো প্রাচীন ঘটনার এক প্রকার পরোক্ষ উল্লেখ মাত্র—ইংরাজী allusion-এর মতো।

কখনও কখনও কবি বর্তমান অবস্থা, জীবন বা আদর্শকে নবতম পরিকল্পনায় সংস্থাপিত করেন। পুরাণ বা ইতিহাসের সংস্পর্শে সে ক্ষেত্রে পরিবেশ নব-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দীপ্তি পায়। অতীতের মূল্য সেখানে নিছক ইঙ্গিতের জন্য নয়, কিম্বা সাধারণ উল্লেখ হিসেবেও নয়, অতীত সেখানে বর্তমান মুহূর্তের মধ্যে জীবন্ত এবং পরিবেশের সঙ্গে সৌন্দর্য-সম্পর্কে সম্পর্কিত। 'ইন্দ্র-পতন'-এর যে অংশে চিত্তরঞ্জনের চিতা-ভস্ম গ্রহণ করে ভাগীরথীধারা ধন্য হয়েছে বলে কবি কল্পনা করছেন, অথবা শবদেহ স্পর্শ করেছে বলে শুচিতর ভেবেছেন অগ্নিকে, অথবা সুগন্ধতর ভেবেছেন অগুরু-পুষ্প-চন্দনকে শবদেহের সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে বলে, সে অংশ নতুন অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। এখানে আমরা নতুন পরিকল্পনার পরিচয় পাই। উপমেয়কে গভীরতর ব্যঞ্জনাদীপ্ত ও প্রস্ফুটিত করবার জন্যই উপমানের প্রয়োজন ও সার্থকতা। এ প্রকারের উপমা নজরুল-কাব্যে যথেষ্ট, বিশেষ করে সে-ধরণের কবিতায় যেখানে হিন্দু-পৌরাণিক তথ্যের সঞ্চয় আছে।

অথবা—

"জরীদার নাগরা পায়ে গাগরা কাঁধে ঘাগরা ঘিরা
বেদূইন-বৌরা নাচে মৌ-টুসকির মৌমাছিরা।
শরমে নৌজোয়ানীর নুইয়ে ছিল ডালিম-শাখা,
আজি তার রস ধরে না, তাম্বূলী ঠোঁট হিঙ্গুল মাখা।
আরবের উঠতি-বয়েস ফুল-কিশোরী ডালিম ভাঙা
বিলিয়ে রঙ কপোলের আপেল-কানন করছে রাঙা।"

কখনও কখনও উপমানকে বিস্তৃত ক'রেছেন, প্রসারিত ক'রেছেন, ইংরাজী'তে যা'কে বলে "in order to dilute rather than to concentrate"। বস্তু এবং রূপকের মধ্যে পার্থক্য এখানে এই যে, বস্তুর সৌন্দর্য অথবা দীপ্তি নির্ণয়ের জন্য রূপকের প্রয়োজন, কিন্তু রূপকও এক্ষেত্রে মেঘমুক্ত শশীর মতো ক্রমান্বয়ে আপনাকে বিকশিত ক'রছে। যেমন ঃ

"পূর্ণ শশীরে হেরিয়া যখন সাগরে জোয়ার লাগে,
উথলায় জল যত কলকল তত আনন্দ জাগে!
তেমনি পূর্ণ শশীরে বক্ষে ধরি'
আমিনার চোখে শুধু জল ওঠে ভরি'।"

অথবা—

"হিয়ায় মিলিল হিয়া,
নদী-স্রোত হল খরতর আরো পেয়ে উপনদী-প্রিয়া।
স্রোতাবেগ আর রুধিতে পারে না, ছুটে অসীমের পানে,
ভরে দুই কূল অসীম-পিয়াসী কুলু কুলু কুলু গানে।
কোথা সে সাগর কতদূর পথ কোন দিকে হবে যেতে—
জানেনা কিছুই, তবু ছুটে যায় অজানার দিশা পেতে।"

মনঃকল্পিত কাব্যশোভাও যে কখনও কখনও নিছক অলঙ্কার নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়কে চিত্রিত করবার একটি উপায়, তাঁর পরিচয় আমরা নজরুলের অনেক উৎকৃষ্ট উপমায় পেয়েছি। বস্তুরূপকের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে তিনি রসিকচিত্তকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

‘বন-গীতি’

নজরুল ইসলামের ‘বনগীতি’ গানের বই। অধিকাংশ গানগুলিই হৃদয়াবেগের বিচিত্র পরিচয় বহন করছে। এ-আবেগ প্রেমকে, স্বদেশানুরাগকে এবং ভক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গানের বক্তব্যে প্রায়ই একটা গতানুগতিকতা থাকে, বিশেষ করে বাংলা গানে। শিল্পী কথার জগৎ গড়ে তোলেন না, প্রচলিত সুরের লহরীতে, অর্থপূর্ণ বিন্যাসে কতকগুলি শব্দকে সাজিয়ে যান। কবিতায় আবেগের অফুরন্ত রহস্যের সঙ্গে শব্দের যে সম্পর্ক থাকে, গানে সেই আবেগ ধরা পড়ে সুরের বিচিত্র কল্লোলে। আধুনিক গান শব্দের বোঝায় সঙ্কুচিত হয়ে অগ্রসর হয়, কিন্তু প্রেম এবং ভক্তির ক্ষেত্রে এসমস্ত শব্দ নতুন বাণীমূর্তি তৈরী করে না। কথাগুলি কেমন যেন অর্থের দিক থেকে দীন এবং বিশীর্ণ। রেকর্ডের গান বা ফিল্মের গান শুনলেই এ সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। রবীন্দ্রনাথের বাণী এর ব্যতিক্রম। সাধারণ শব্দও নবতম ধ্বনি ও ব্যঞ্জনায় অপূর্ব হ’য়ে উঠেছে। নজরুল ইসলামের গান রেকর্ডের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখিত হলেও অনেক সময়ই শব্দে, উপমায়, বর্ণে ও বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের গানের মতই প্রাণোচ্ছল। স্বল্প-রেখায় সম্পূর্ণ চিত্রও যেমন ইঙ্গিতে পরিচ্ছন্নভাবে ফুটে উঠে, গানের শব্দ-মূর্তির পরিসরেও জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে পূর্ণতা-দ্যোতক ভাবেই পাই।

‘বন-গীতি’র অনেকগুলি প্রেমের গানে কল্পনার দিন-রাত্রিতে তন্দ্রাবিমুক্তা প্রিয়তমার চাঞ্চল্য ও শিহরণের সংবাদ আছে। কল্পনার

সত্য, আন্তরিকতার স্পর্শে মর্যাদাবান হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করছি। অধিকারের দাবী থেকে উদ্ভূত নিশ্চিত বিশ্বাস এবং উদাসীন মনের শান্ত বিহ্বলতা গানের সুরের বিলম্বিত লয়ের মধ্যে ধরা পড়েছে। গানটি এই :

"পাষাণের ভাঙ্গালে ঘুম
কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়।
গলিয়া সুরের তুষার
গীতি-নির্ঝর বয়ে যায়॥

উদাসীন বিবাগী মন
যাচে আজ বাহুর বাঁধন,
কত জনমের কাঁদন
ও পায়ে লুটাতে চায়॥

তোমার চরণ-ছন্দে মোর
মুঞ্জরিল গানের মুকুল,
তোমার বেণীর বন্ধে গো
মরিতে চায় সুরের বকুল।
চমকে ওঠে মোর গগন
ঐ হরিণ-চোখের চাওয়ায়॥"

অন্য একটি গানে কবি বলছেন যে, হৃদয়ে যার অবস্থান তাকেই তিনি হারিয়েছেন, তাই 'গানের প্রদীপ' জেলে তাকে অন্বেষণ করতে হচ্ছে। সে এসেছিলো একদিন 'স্নিগ্ধ জ্যোতি' নিয়ে আর আজ তাকে অন্বেষণ-ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়ে সন্ধান করতে হচ্ছে অসীম অন্ধকারে। চিরকালই দেখা যায় যে, মিলন-বেলাভূমেই "বিরহের রোদন ধ্বনি" উচ্চারিত হয়।

আর একটি গান উদ্ধৃত করছি। গানটিতে একটি সজল স্নিগ্ধতা আছে :

"কে এলে মোর চির-চেনা
অতিথি দ্বারে মম।
ফুলের বুকে মধুর মত
পরাগে সুবাস সম॥
বর্ষা-শেষে চাঁদের মতন
উদয় তোমার নীরব গোপন,
জ্যোৎস্না-ধারায় নিখিল ভুবন
ছাইয়া অনুপম॥
হৃদয় বলে, চিনি চিনি
আঁখি বলে, দেখিনি তায়,
মন বলে, প্রিয়তম॥"

কয়েকটি গানে আবার গতানুগতিকতা অত্যন্ত বিমর্ষভাবেই মূর্ত হয়েছে। যেমন :

"কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল।
টগর যূথি, বেলা মালতি
চাঁপা গোলাপ বকুল।
নার্গিস ইরানী গুল্॥"

অথবা—

"কোকিল, সাধিল কি বাদ।
নিশি অবসান হ'ল
না মিটিতে সাধ॥"

অথবা—

"দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে আজি সমাধিতে মোর।
এত দিনে কি আমারে
পড়িল মনে মনোচোর"

উপমা ও রূপকের সাহায্যে রহস্যঘন চিত্র নজরুল ইসলাম এঁকেছেন অনেক কবিতায় ও গানে। রূপ ও অরূপ, বস্তু ও কল্পনা এবং সত্য ও স্বপ্ন ওতপ্রোত রয়েছে কবিতার ভাষায় ও ভাব-রূপে। সত্যিকারের রূপক যে নিছক অলঙ্কার নয়, বরঞ্চ কবি-কল্পনার ভাব এবং ভাষার মিলিত বিগ্রহ, নজরুল ইসলামের রচনায় কখনও কখনও তার পরিচয় পাই। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে ঃ

"ও-পারে লুকায়ে আঁধার
গভীর মন বন-ছায়,
আকাশে হেলান দিয়ে
আলসে পাহাড় ঘুমায়।
ঘুমায় দূরে সে কোন্ গ্রাম
বাসরে পল্লী বধূর প্রায়।
ও-পারে ধূ ধূ বালুচর
কেন নদীর আঁচল লুটায়।
ছাড়ি' এ সুখ-বাস
চলেছ কোথায় গো মেয়ে ॥"

একটি ভক্তিভাবের গানের উল্লেখ ক'রে 'বন-গীতি'-প্রসঙ্গ শেষ করব। ইসলামের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসবাদ এবং পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে গানের কথাগুলি অবশ্য অত্যন্ত আপত্তিজনক। কবি হিন্দু দেবী কালীকে মানবজীবনের স্থিতি, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক বলে কল্পনা ক'রেছেন। এখানে পরম আন্তরিক একটি সঙ্কোচহীন বাণী-মূর্তির প্রকাশ লক্ষ্য করি। নিকষে সোনার রেখার মতো "কালো মেয়ের পায়ের তলায়" কবি আলোর খেলা দেখেছেন। গানটি এই :

"আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন ॥

আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি-শশি দোলে
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন ॥

পাগলী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়
লীলার য়ে তার নাইকো শেষ ॥

সিন্ধুতে ঐ বিন্দু খানিক
তার ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মাণিক
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না
মা আমার তাই দিগ্‌-বসন ॥"

রূপ ও রূপকের এবং নিষ্ঠা ও হৃদয়াবেগের এত চমৎকার মিলন ভক্তিভাবের গানেও বড় একটা দেখা যায় না।

'জুল্‌ফিকার'

নজরুল ইস্‌লামের 'জুল্‌ফিকার'-এর গানগুলি ইস্‌লাম-সংক্রান্ত। কবি মুসলমানদের বর্তমান বিমর্ষ ও হতচেতন অবস্থার কথা চিন্তা করে ব্যাকুল হয়েছেন এবং তাদের প্রাচীন সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করেছেন। যে-কারণে একসময় সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য তা'দের এসেছিল, সে-কারণগুলি বর্তমানেও স্পষ্ট হোক—কবির কাম্য তাই। নিছক কাব্যসৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলে এ-প্রকৃতির মনোভাবে সমৃদ্ধমান কাব্যগত আবেগ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ-প্রকৃতির মনোভাব জীবনতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে জীবনের উপর আরোপিত ধর্মাদর্শ বা রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সাধারণতঃ সম্পর্কিত হয়। আমরা উদাহরণ স্বরূপ হেমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ-প্রকাশক কবিতাগুলির উল্লেখ এখানে করতে পারি। 'জুল্‌ফিকার'-এর কয়েকটি গানের আংশিক উদ্ধৃতি দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে, যেমন :

"দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
    দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ্‌ জেগে
    তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল ॥

গাজী মুস্তাফা কামালের সাথে
    জেগেছে তুর্কী সুর্খ্‌-তাজ,
রেজা পহ্‌লবী সাথে জাগিয়াছে
    বিরান মুলুক ইরানও আজ,
গোলামী বিসরি' জেগেছে মিসরী
    জগলুল সাথে প্রাণ মাতাল ॥"

অথবা—

"কোথায় সে বীর খালেদ,
কোথায় তারেক মুসা,
নাহি সে হজরত আলি,
জুলফিকার নাহি।"

অথবা—

"জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান।
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান ॥"

অথবা—

"আল্লাহ্‌ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগতময় ॥
আমার কিসের শঙ্কা
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয় ॥"

এগুলো পাঠ করলে মনে হয় যে, কবির শুধু কতকগুলো বক্তব্যই আছে এবং সে বক্তব্যগুলির সঙ্গে শব্দবিন্যাস, ধ্বনি এবং উপমা-রূপকের আবেগগত কোন সম্পর্ক ঘটেনি। তবে প্রচারমূলক সঙ্গীতের স্বাভাবিক যে মূল্য, সে-মূল্য এগুলোকে দিতেই হবে। প্রচারমূলক সঙ্গীতে কথাটি প্রধান এবং এ-কথাকে স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ করবার জন্য কবি বিশেষ কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এ-শব্দগুলো এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শ্রোতা-সাধারণ কোনপ্রকার চিন্তা না ক'রে এবং সঙ্গীতের মূর্ছনায় আচ্ছন্ন না হ'য়ে সহজেই বক্তব্যের দ্বারা উদ্দীপ্ত হতে পারে। বক্তব্যের সে-উদ্দীপনা নজরুল ইসলামের এ গানগুলোতে আছে, যেমন আছে মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় ফোয়ারা'য় অথবা ইসমাইল হোসেন শিরাজীর 'অনল প্রবাহ'-এ।

'জুলফিকার'-এর কিছু গান মুর্শিদী-মারফতী ধরণের, যেমন ঃ

'আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান হাজার মোয়াজ্জিন,
প্রাণের 'লওহে' কোরান লেখা
রুহ্ পড়ে তা রাত্রিদিন।"

অথবা—

"আহ্মদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ্ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন।"

এ-গানগুলোর কাব্যবিচার না করাই সঙ্গত। এ-গুলোর মূল্য তত্ত্বরসিকদের কাছেই।

কতকগুলো গানে অনিবার্যভাবে আমাদের বাংলা দেশের সমাজ, সংসার এবং পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং সে কারণেই সেগুলো মধুর হয়েছে। যে-জীবন কবির কাছে অত্যন্ত সত্য এবং নিবিড়ভাবে অনুভূত, সে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আপন ধর্মাবেগকে প্রকাশ করেছেন। যেমন ঃ

'তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে॥
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে॥"

মধু পূর্ণিমার চাঁদ অথবা সকাল বেলার সূর্য আমাদের কাছে যত সুন্দর ও তৃপ্তিসঞ্চারী অন্য কোনও দেশের অধিবাসীর কাছে ততটা নয়। মনে রাখা দরকার যে, আরব দেশে সূর্য কখনও সুন্দরের প্রতীক হতে পারে না।

অন্য এক ক্ষেত্রে কবি বলছেন ঃ

“পথ সে দেখায় ঈদের চাঁদের পিদিম নিয়ে হাতে,
হেসে হেসে দাঁড় টানে চার আসহাব তাঁর সাথে।
নামাজ রোজার ফুল ফসলে শ্যামল হ’ল মরু
প্রেমের রসে উঠ্‌ল পূরে নীরস মনের তরু।
খোদার রহম এলরে আখেরে নবীর বেশে।”

এখানে নৌকোর রূপক এবং প্রদীপ ও ফুল-ফসলের রূপকের মাধ্যমে কবি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, আনন্দ এবং সজীবতার পরিচয় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এগুলো হওয়ার কারণ সম্বন্ধে কবি বলছেন ঃ

“দূর আরবের স্বপন দেখি বাঙলা দেশের কুটির হ’তে
বেহোশ হ’য়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে।”

একটি গানে বাংলা দেশের গ্রাম্যজীবনের কর্মধারা এবং পরিবেশকে কবি পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন আপন তত্ত্বজিজ্ঞাসার ঃ

“আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে।
ফল্‌বে ফসল বেচ্‌ব তারে কিয়ামতের হাটে ॥
পত্তনীদার যে এই জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবিজীর
বেহেশ্‌তেরই তালুক কিনে বস্‌ব সোনার খাটে ॥

মসজিদে মোর ধরাই বাঁধা হবেনাকো চুরি।
মনকের নকির দুই ফেরেশ্‌তা হিসাব রাখে জুড়ি।
রাখব হেফাজতের তরে
ইমানকে মোর সাথী ক’রে
রদ্ হবেনা কিস্তি, জমি উঠবেনা আর লাটে।”

আর একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি, যেখানে ইংরেজীতে যাকে বলে element of surprise অর্থাৎ বিস্ময়বোধ, সেই বিস্ময়বোধের মধ্য দিয়ে এবং অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কবি প্রগাঢ় উপলব্ধির ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন :

"পু'ড়ে মরার ভয় না রাখে
পতঙ্গ আগুনে ধায়,
সিন্ধুতে মেটেনা তৃষ্ণা
চাতক বারি-বিন্দু চায়,
চকোর চাহে চাঁদের সুধা
চাঁদ সে আস্‌মানে কোথায়,
সুরুয থাকে কোন সুদূরে,
সূর্যমুখী তারেই চায়,
তেমনি আমি চাহি খোদায়
চাহিনা হিসাব করে ॥"

‘ফণি-মনসা’

‘ফণি-মনসা’ পাঠ-কালে যে-কোনো পাঠকের মনে এ-প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এটা কি কাব্যগ্রন্থ না অন্য কিছু? কবি কি করতে চেয়েছেন এবং কিইবা করতে চাননি? সাধারণতঃ আধুনিক কাব্য-বিচারে আমরা যে-সমস্যার সম্মুখীন হই, এক্ষেত্রে সমস্যাটি তার বিপরীত। দুর্বোধ্যতার অভিযোগ থেকে আধুনিক কবিকে আমরা যেখানে রক্ষা করতে চাই, নজরুল ইসলামকে আমাদের সেখানে রক্ষা করতে হবে তরলতা এবং অতি স্বচ্ছতার অভিযোগ থেকে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছেন বলে আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ যথেষ্ট; কিন্তু নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার সাংবাদিকতার জন্য। মানুষের অতি সাধারণ সমষ্টিগত অনুভূতির কাছেই তিনি আবেদন এনেছেন।

নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা সাময়িক, বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের এবং যুগের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আজকের ঘটনার সঙ্গে বা আবেগের সঙ্গে যে-কাব্যের সম্পর্ক নেই তাকে অস্বীকার করবার প্রবণতা কখনো কখনো দেখা যায়, কিন্তু বিগত দিনের ঘটনার সঙ্গেই যে-কাব্যের একমাত্র সম্পর্ক তা’কে আমরা সর্বমুহূর্তেই অস্বীকার করি। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যয়-সাহচর্যের জন্য কখনো কখনো কোনো কবিতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু ভবিষ্যতে কবিতা যদি পঠিত হয়, তবে এ সাহচর্য ব্যতিরেকেই পঠিত হবে। রাজনৈতিক যে আদর্শের সঙ্গে আমাদের

মতের ঐক্য নেই, সে-আদর্শ যদি কোনো কবিতায় ব্যাখ্যাত হয় তবে সে-কবিতাকে আমরা মূল্য দেব না। অধিকাংশ পাঠক কবিতায় ইম্‌পিরিয়ালিজম্ বা সোশ্যালিজম্-এর সন্ধান করে না। এখানে প্রকৃত প্রস্তাবে জিজ্ঞাস্য এ নয় যে, কোন্‌টা ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক, কিন্তু জিজ্ঞাস্য মূলতঃ এই যে, কোন্‌টা লোকোত্তীর্ণ এবং চিরস্থায়ী। আপন যুগের সঙ্গে যে-কবির কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁর বক্তব্যও মূল্যবান এবং শ্রুতিগ্রাহ্য হ'তে পারে; অন্যপক্ষে যে-কবি শুধু সাময়িক সমস্যা বা সাময়িক ধারণা-বাসনার সঙ্গেই সম্পর্কিত, তাঁর সব রচনাই মূল্যহীন হয়তো হবে না। টেনিসন তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা সার্থক প্রতিনিধিরূপে যুগের উৎকণ্ঠা, বিশ্বাস এবং ধর্মজিজ্ঞাসাকে In Memorium-এ রূপ দিয়েছেন। সে যুগের সন্দেহ বা বিশ্বাস তাঁর কাব্যে অবিনশ্বরতা পেয়েছে, যদিও পরবর্তী যুগে এ-সন্দেহ-বিশ্বাসকে মানুষ অতিক্রম ক'রেছে বা হয়তো তার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে।

নজরুল ইসলামের 'ফণি-মনসা'র কবিতাগুলো সম্পর্কে একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এগুলো কবিতা নয়। নিছক সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার নিয়েই এগুলো লেখা, এ-ছাড়া শিল্প-সাধনার দিক থেকে মহত্তর কোনো উদ্দেশ্যই কবির নেই। বিস্মিত হবার ব্যাপার এই যে, সত্যিকারের কবিতা লিখ্‌বার ভানও কবি করেননি। কিন্তু তবুও যেন ক'বর অজ্ঞাতসারেই কবিতা লিখিত হয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে হঠাৎ যেন কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন:

> "ঊষায় যারা চম্‌কে গেল তরুণ রবির রক্ত রাগে,
> যুগের আলো! তাদের বল, প্রথম উদয় এম্‌নি লাগে!
> সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
> তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল ক'রেছে বর্ষা-ধারা।"
>
> (যুগের আলো)

উদ্ধৃত অংশে গভীরতর উৎস থেকে, রাজনীতির আচ্ছন্নতা ভেদ ক'রেই প্রাণের বাণীর পরিচয় এসেছে।

আমি এখানে ইংরাজ কবি কিপ্‌লিং-এর কিছু কবিতার উল্লেখ করবো, যে-সমস্ত কবিতার উপলক্ষ্য হচ্ছে সমসাময়িক কোনো দুর্যোগ এবং রাজনীতি বা সমাজনীতি। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংস এবং সে-সময়কার চিন্তাগত বিপর্যয়ের পরিচয় তিনি দিয়েছেন Epitaphs of the War (1914-18) নামক কাব্য-কথায়। এখানকার কবিতাগুলোতে মৃত্যুর স্তব্ধতা জীবনকে যে নতুন মূল্যমান দিয়েছে, বিস্ময় ও বেদনার মধ্যে তা'র পরিচয় আছে। যেমন :

"My name, my speech, myself I had forgot.
My wife and children came—I knew them not.
I died. My mother followed. At her call
And on her bosom I remembered all."

কবিতাটির নাম Shock—মানসিক আঘাত বা বিহ্বলতা। যুদ্ধে যে সৈনিক এসেছে, যুদ্ধের ভয়াবহতায় সে বিস্মৃত হ'য়েছে সমস্ত কিছু—আপন অস্তিত্বকেও। তা'র মৃত্যু হ'ল এবং সন্তানের মৃত্যুর আঘাত সহ্য ক'রতে না পেরে মাতাও তা'র অনুগমন করলেন। মৃত্যু-দেশে মাতার বক্ষলগ্ন হ'য়ে তা'র স্মরণে এলো আপন পরিজন এবং সমস্ত সংসারের কথা। কবি এখানে দুর্লভ মানবীয় বোধের পরিচয় দিয়েছেন দুই বিরুদ্ধ আবেগের সংঘর্ষে, বৈপরীত্যে এবং বেদনায়।

অন্য একটি কবিতায় পথহীন বিজন প্রান্তরের একটি কবর, পক্ষ-তাড়নারত পেলিকানকে লক্ষ্য করে বলছে :

"The blown sand heaps on me, that none may learn
Where I am laid for whom my children grieve—
O wings that beat at dawning ye return
Out of the desert to your young at eve!"

এখানকার চিরস্থায়ী আবেগ হচ্ছে সন্তান-বাৎসল্য। সন্তান তা'র পিতার বালুকাকীর্ণ কবরের সন্ধান পাবে না, তাই পেলিকানকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেন সে সন্ধ্যায় তা'র আপন সন্তানের কাছে ফিরে যায়। সন্তান-বাৎসল্যে তা'র দোসর আছে, এই তৃপ্তিতেই মৃত সৈনিক যেন আপন কবরের নিশ্চিহ্নতাকেও মেনে নিতে পারবে।

কিপলিং-এর অন্য একটি কবিতার উল্লেখ এখানে করবো। কবিতাটির নাম 'Recessional'. এ' কবিতাটিতে কবি সাম্রাজ্যবাদিতাকে আবেগের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু অধিকার-লিপ্সা সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শক্তি হলেও এবং এ-কারণে সাম্রাজ্যবাদ মুক্তিকামী পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে গ্লানিকর এবং ঘৃণ্য বলে গৃহীত হলেও, শুধুমাত্র আত্মনিবেদনের আন্তরিকতা এবং গীর্জায় উচ্চারিত স্তোত্রের বাণীভঙ্গীর জন্য, এ-কবিতাটি সাময়িকতার ঊর্ধ্বে উঠেছে। কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

"God of our fathers, known of old,
Lord of our far-flung battle-line,
Beneath whose awful Hand we hold
Dominion over palm and pine—
Lord God of Hosts, be with us yet,
Lest we forget—lest we forget !"

কিপলিং-এর এই অবিনশ্বর আবেগ পরিপূর্ণভাবে না হলেও এবং সর্বক্ষেত্রে না হলেও কিছুটা লঘুভাবে কোথাও কোথাও নজরুল-কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের কাব্যে সাময়িকতা মূল্যহীন হয়নি এ-কারণে যে, এখনো তার পরিবর্তন ঘটেনি। অসাম্য, ভেদবুদ্ধি এবং ক্ষেত্রভেদে মানুষের প্রতি অবহেলা বা শ্রদ্ধা আজও নৈমিত্তিক সত্য, তাই সাধারণের কাছে শুধুমাত্র সাময়িকতার জন্যই নজরুল

ইসলামের অনেক কবিতা মূল্যবান বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে। যেমন 'ফণি-মনসা'র 'শ্রমিক-মজুর', 'রক্ত পতাকার গান', 'জাগরুক তূর্য' এ সমস্ত কবিতা। তবে মনে রাখ্‌তে হবে, এ-কবিতাগুলো প্রচারের উদ্দেশ্যেই লিখিত। মানুষের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গেই এ-কবিতাগুলোর সম্পর্ক, গভীরতর ব্যঞ্জনা এসব ক্ষেত্রে কোথাও নেই। আমি পূর্বেই বলেছি যে, এগুলো যে কবিতা নয়, তা ভাবার চাইতে একথা ভাবাই ভাল যে, এখানে কবিতা লিখবার ভানও কবি করেননি। 'শ্রমিক মজুর' থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করলে কথাটি স্পষ্ট হবে ঃ

> "ভদ্রসমাজে শ্রমিকের কথা 'কমিক' গানের মত
> ভব্যের মত মোরা নহি নাকি সু-সভ্য সংযত।
> আচারে পোশাকে আমাদের নাই ভদ্রের মত চাল,
> চা'ল চুলা নাই দারিদ্র্যে দুখে নাচার ও নাজেহাল।
> আমাদের বাসা আমাদের ভাষা নিত্য নোংরা, দাদা!
> তবুও বলিব, বাহিরে আমরা নোংরা, ভিতরে সাদা।
> ভিতরের কালি ঢাকিতে তোমরা পর হ্যাট, প্যাণ্ট, কোট,
> শ্রমিকেরে যারা গরু বলে, মোরা তাদেরে বলি 'হিগোট'।"

সময় এবং কালের বিস্তৃত প্রসার সম্পর্কে কবির সচেতনতা থাকা বাঞ্ছনীয়, কেননা সত্যিকারের কবি একই সঙ্গে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবেন। 'ফণি-মনসা'য় নজরুল ইসলামের এ-সচেতনতা আছে বলে মনে হয় না। তিনি এখানে ছন্দোবদ্ধ পদরচয়িতা, ইংরেজীতে যাকে বলে verse সেই verse স্রষ্টা। মহৎ কবিতা বা সুন্দর কবিতা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কিন্তু নিছক verse, যা বিশেষ প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্রে একান্ত মূল্যবান, 'ফণি-মনসা'য় নজরুল ইসলাম তারই কবি।

নজরুল ইস্‌লামের কাব্যের ঐতিহ্য

কোনও কবির কাব্যগত ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হ'তে হ'লে, তাঁর কাব্যের শব্দরূপ এবং বাণীমূর্তির দিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে, কেননা শব্দ এবং ধ্বনির প্রশ্রয়েই কবিতার অর্থ ধরা পড়ে। কবির বক্তব্য কাব্যের শব্দ-মূর্তির সঙ্গে বিজড়িত, অনেকটা অঙ্গাঙ্গী সংযোগের মতো। কাব্য রহস্য সৃষ্টি করতে পারে, মানব-মনে অনুপ্রেরণা আনতে পারে, সাধারণের উপভোগের অতিরিক্ত একটা আনন্দবোধ জাগাতে পারে, কিন্তু কবিতা প্রধানতঃ এবং মূলতঃ ভাষার সম্ভাবনা নির্ণয় করে থাকে। এভাবে ভাষার সম্ভাবনা নির্ণয়ের মধ্যেই কবিতার ঐতিহ্য নিহিত থাকে। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটি স্পষ্ট হবে। 'মরমী' কবিতায় নজরুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

"কোন্ মরমীর মরম ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতো সে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে
বুঝেছি তা' প্রাণের টানে।"

এ-উদ্ধৃতির প্রতিটি শব্দের মূল্য অভিধানগত অর্থের উপর নির্ভরশীল। তাই এখানকার ঐতিহ্য নতুন কিছু নয়—সাধারণ

বাংলা গানের চিরাচরিত ভাবরূপ মাত্র। কিন্তু ‘নিকটে’ কবিতায় কবি যখন বলেন ঃ

“বাদলা কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এলো রিম্‌ঝিমিয়ে
বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পাঁয়জোরেরই শিঞ্জিনী যে
ফুট্‌লো উষার মুখটি অরুণ, আইল বাদল তাম্বূ ধরায়
জম্‌লো আসর বর্ষা বাসর, লাও সাকী লাও ভর পিয়ালায় ॥”

তখন কোন শব্দই সাধারণ অভিধানগত অর্থ ব্যক্ত করে না। প্রাচীন ইরাণী কাব্যধারার সঙ্গে আমরা মূহূর্তেই সম্পর্কিত হই, অর্থাৎ কবি তাঁর শব্দ-প্রয়োগ এবং বিন্যাসের বিশিষ্টতায় একটি বিশেষ ঐতিহ্যের রস-রূপে সঞ্জীবিত হন। বৃষ্টিধৌত সুস্নিগ্ধ উষায় যে-বাসনার রসাবেশ কবির মনকে আচ্ছন্ন করেছে, ঘটনার দিক দিয়ে তা কোনও প্রাচীন ব্যাপার নয়—কিন্তু তাতে অতীতের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার একটি আধুনিক স্থিতি ঘটেছে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এ-হেন রূপকল্পকেই আমরা কাব্যগত ঐতিহ্য আখ্যা দিয়ে থাকি। টি, এস, ইলিয়ট ঐতিহ্যকে এ-অর্থেই ব্যবহার করেছেন—the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of is presence—অতীতের অতীতত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানতার প্রয়োজন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে।

নজরুল ইসলামের কাব্যে এ-ঐতিহ্য বিচিত্ররূপা। সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কখনও তা হিন্দু-পৌরাণিকবোধকে জাগ্রত করেছে, আবার কখনও পারসিক ঐশ্বর্য, বিলাস ও আনন্দের কথা স্মরণ করেছে। কিন্তু ভক্তি-ভাবের ক্ষেত্রে পৌরাণিকবোধটাই বেশী প্রবল।

‘ঝড়ের’ বর্ণনায় নজরুল ইসলাম কখনও কখনও যে-রূপকের কল্পনা করেছেন, তা অনিবার্যভাবে প্রতীকধর্মী পৌরাণিক জীবনের।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

"হেরিলাম সেবারতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ,
সহসা সে ভুলিয়াছে সেবা, আগমন ভয়ে মোর,
প্রস্তর শিলার সম নিশ্চল নিশ্চুপ।
অনুমানি' যেন কোন্ সর্বনাশা অমঙ্গল ভয়
জাগি' আছে শিশুর শিয়র পাশে ধ্যানমগ্না মাতা,
শ্বাস নাহি বয়।

মনে হোল এই বুঝি হারা-মাতা মোর!
মৌনা ঐ জননীর শুভ্র শান্ত কোলে
প্রহ্লাদ ফুলের আমি কাল-দৈত্য-শিশু—
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, 'মা আমার' বলে।
নাহি জানি কোন্ ফণী-মনসার হলাহল-লোকে
কোন বিষ-দীপ-জ্বালা সবুজ আলোকে—
নাগমাতা কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি সহস্র-ফণা-নাগ
ভীষণ-তক্ষক শিশু! কোথা হয় নাগনাশী জন্মেজয় যাগ—
উচ্চারিছে আকর্ষণমন্ত্র কোন গুণী—
জন্মান্তর-পার হতে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু-ডাক শুনি।
মন্ত্র তেজে পাংশু হয়ে ওঠে মোর হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ প্রাণ
আমার তুরীয় গতি সে যে ঐ অনাদি উদয় হতে
হিংসা-সর্প যজ্ঞ-মন্ত্র টান!"

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-কিম্বদন্তির ঐতিহ্য অপূর্বভাবে নজরুল ইসলামের কল্পনায় প্রবাহিত হয়েছে। আপন মজ্জায় তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের চাঞ্চল্য অনুভব করেছেন। এ ঐতিহ্য এতটা তীক্ষ্ণভাবে মর্মানুবিদ্ধ হয়েছে যে, রসুলের আবির্ভাবের কথা বলতে যেয়ে, 'কমল বিহারী' ও 'বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার-ধ্বনি'র স্বপ্ন দেখেছেন ঃ

"শাস্ত্র-আচার জগদ্দল-শিলা বক্ষে নিশাস রুদ্ধপ্রায়
খোঁজে প্রাণ, বিদ্রোহী কোথায় !
খুঁজিছে দুখের মৃণালে রক্ত-শতদল শত ক্ষত ব্যথায়,
কমল-বিহারী তুমি কোথায় !
আদি ও অন্ত যুগযুগান্ত দাঁড়ায়ে তোমার প্রতীক্ষায়,
চির সুন্দর, তুমি কোথায় !
বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার-ধ্বনি অবিশ্রান্ত গাহিয়া যায়,—
তুমি কোথায়, তুমি কোথায় !"

প্রশংসিত মানবের আবির্ভাবের জন্য যে পরিবেশের কল্পনা তিনি করেছেন, তার ঐতিহাসিক-বোধ অসার্থক এবং ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' কবিতায় যে ঐতিহ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা' উন্মেষ-যুগের ইসলামের স্বপ্ন বহন করে এনেছে। এ কবিতা পাঠে আমরা বুঝতে পারি যে, যথার্থ শিল্পীর হাতে উপমা, রূপক, শব্দ ও ধ্বনি অশেষ সম্ভাবনার পরিচয় বহন করে। কবিতাটির আরম্ভ এ-ভাবে ঃ

"নাই তাজ—
তাই লাজ ?
ওরে মুস্‌লিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ !
করে তসলিম হর কুর্নিশে শোর আওয়াজ
শোন্ কোন্ মুঝ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা মাঝ !
উর্‌জ্ য়্যামেন নজ্‌দ্ হেযাজ তাহামা ইরাক সাম
মেসের ওমান তিহারান—স্মরি' কাহার বিরাট নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম' !

চলে আঞ্জাম,
দোলে তাঞ্জাম,
খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম !
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর, হাতে আব্‌জম্‌ জম্‌ জাম।
শোন্‌ দামাম্‌ কামান্‌ তামাম্‌ সামান্‌—
নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম' ।"

এখানে কবি ইসলামের ঐতিহ্যের উন্মেষ ও কর্মধারার পরিচয় বহন করেছেন শব্দের অপূর্ব হিল্লোল, ধ্বনিতরঙ্গ এবং অর্থ-গভীরতায়। শুধুমাত্র স্থানবাচক বিশেষ্যের পরস্পর অবস্থিতিতেই যে ইতিহাসের সম্পদ এবং ক্রমধারার পরিচয় বহন করা চলে, তার পরিচয় আছে উপরের উদ্ধৃতির সপ্তম অষ্টম নবম চরণে। এ কবিতাতেই অন্যত্র শব্দের বাণীবিন্যাস ও ধ্বনিতরঙ্গের অন্তরালে নীল ও সবুজ বর্ণের প্রলেপ লেগেছে। লোহিত সাগরের নীলায় মিশেছে মরুভূমির মরূদ্যানের শ্যামল বন :

"দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে বাগে-বাগ
পশ্চিমে নীলা লোহিতের খুন্‌-জোশীতেরে লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ !"

অথবা—

"ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরাণী দূরাণী তুর্কীর !"

এখানকার সুর্খীর রক্তিমাভা স্পর্শ-সঞ্চারী ও ক্রম-বিস্তৃত। নজরুল ইসলাম যৌবনের উল্লাসকে নিরীক্ষণ করেছেন ইরাণী ঐশ্বর্যের রশ্মিরেখায়। শব্দের মোহনীয়তাই এখানে সব কিছু।

গভীরতর ব্যঞ্জনায় জীবনের মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা নেই। হঠাৎ হাওয়ায় গাছের পাতা যেমন কেঁপে উঠে, তেমনি যৌবনাবেগে সমস্ত জীবনেই যেন শিহরণ জেগেছে ঃ

> ‘সাধ করে আজ বরবাদ করে দিল্ সবাই—
> নিমখুন কেউ—কেউ জবাই।
> নিক্‌পিক্ করে ক্ষীণ কাঁকাল,
> পেশোয়াজ কাঁপে টালমাটাল,
> গুরু উরু-ভারে তনু নাকাল—
> টলমল আঁখি জল-বোঝাই!
> হাফিজ উমর সিরাজ পালায়ে লেখে রুবাই!
> নিমখুন কেউ—কেউ জবাই—!”

কখনও কখনও রূপকের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহ্যেরই মিশ্রণ দেখতে পাই। একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

> “আমি ছিনু পথ-ভিখারিণী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
> মুসাফিরখানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে?
> মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্‌বীর,
> ‘তসবী’তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখিনীর!
> ‘তশবীহি’ রূপ এই যদি তাঁর ‘তন্‌জিহি’ কিবা হয়,
> নামে যাঁর এত মধু ঝরে, তাঁর রূপ কত মধুময়!
> কোটি তারকার কীলক-রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খু’লে
> মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে উঠে কুতূহলে।”

এখানে সূফী তাসাওয়াফ পরিণত হ’য়েছে বৈষ্ণব রূপানুরাগ তত্ত্বে। কবিতাটির নাম ‘আর কতদিন’। কবি সূফী সাধনার আত্মবিলোপন ও বে-খুদী তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণলীলার

রূপককে তিনি অতিক্রম ক'রতে পারেন নি। ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্যকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বৈষ্ণব তত্ত্বরূপে তাঁর কল্পনা সিঞ্চিত হ'য়েছে, তাই অতীতের ঘটনার উল্লেখের ক্ষেত্রে (allusiveness-এর ক্ষেত্রে) ইসলামী তারীখের প্রয়োজন থাকলেও, রূপকল্পনা বিশেষণ ও আবেগের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-কাব্যধারাই সক্রিয়। যেমন :

> "দূর গিরি হ'তে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ-ই-তুর ধারী ?
> আমারি মত কি ওরি ডাকে মূসা হ'ল মরু পথচারী ?
> উহারি পরম রূপ দে'খে ঈসা হ'ল নাকি সংসারী ?
> মদিনা-মোহন আহমদ ওরি লাগি, কি চির-ভিখারী ?
> লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হ'ল যাহার কাবা দে লে,
> কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি কালি দিল কুলে,
> কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে, সাকী, মোরে মজাইলি,
> প্রেম-নহরের কওসর ব'লে আমারে জহর দিলি ?"

এ উদ্ধৃতিতে মদিনা-মোহন বিশেষণ এবং কত রূপবতী যুবতীর কুলে কালি দেওয়ার রূপকটি বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলার কাহিনীকেই স্পষ্ট করে।

অনেকগুলি উপমা ও রূপকালঙ্কার বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের নিজস্ব সৃষ্টি। ইংরাজী কাব্যধারায় তাদের ঐতিহ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্ণয় করা চলে হয়ত, কিন্তু বাংলার কাব্যে তারা নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি ক'রেছে। যেমন :

> "এসো, তুফান যেমন আসে,
> সুমুখে যা পাবে দ'লে চ'লে যাবে অকারণ উল্লাসে।
> আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
> কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবেনা কাহারও ক্ষতি।"

অথবা—

"খোলো অর্গল পাষাণের, খুশী বহুক অনর্গল,
ঝাঁক বেধে নীল আকাশে কেমন ওড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, ওঠ দূর গিরি চুড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে !"

অথবা—

"বণিকের দুটো জাহাজ ডুবিবে, তা ব'লে সিন্ধু-ঢেউ
শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে—শুনিয়াছে কভু কেউ ?
ঐরাবত কি চলিবেনা, পথে পিপীলিকা মরে ব'লে ?
ঘর পুড়ে ব'লে প্রবল বহ্নি-শিখা উঠিবেনা জ্বলে ?
অঙ্ক কষেনা, হিসাব করেনা, বেহিসাবী যৌবন,
ভাঙা চাল দে'খে নামিবেনা কিরে শ্রাবণের বর্ষণ ?"

অথবা—

"তরু ভেঙে পড়ে তাই বলে ঝড় আসিবেনা বৈশাখী ?
ভীরু মেষ-শিশু ভয় পায় ব'লে রবেনা ঈগল পাখী ?"

অথবা—

"যাচিয়া সে যারে চাহে বরি নিতে, হানিতে সে হেলা কভু পারে ?
বিরাট সাগরে পায় কি ঝর্ণা ? মহানদী মেশে পরপারে !
যৌবন ? সে ত ক্ষণিক স্বপন, ছুঁইতে স্বপন টুটিয়া যায়
প্রেম সেথা চির মেঘ-আবৃত, তনু সেথা ভোলে তনু মায়ায়।"

অথবা—

"চক্ষে ইহার পলক-বিহীন দৃষ্টি গভীর নিতল নীল।"

অথবা—

"অস্ত আকাশ অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি
কাঁদিতেছে চাঁদ, মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকী!
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায় ঢুলুঢুল,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।"

বিদ্রোহ-বাণীর বন্যায় নজরুল ইসলাম বাংলার মৃত্তিকাকে প্লাবিত ক'রেছিলেন। এ-বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে চেষ্টা ক'রেছেন অনেকে কিন্তু এ-পর্যন্ত স্পষ্টভাবে কেউ বল্‌লেন না যে, এ বিদ্রোহের সঙ্গে কবিতার বাণীমূর্তি বা কারুকর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে একমাত্র সম্পর্ক একটি মনের। এর ঐতিহ্যও বাংলার কাব্যের ঐতিহ্য নয়। একটি চঞ্চল মন বিশৃঙ্খল ভাব-বন্যায় বাংলাকাব্যের স্নিগ্ধ প্রবাহকে ঘূর্ণায়মান ক'রে তুলেছিলো। কক্ষচ্যুত উল্কা গ্রহলোকের শৃঙ্খলাকে যেমন অকস্মাৎ চমকিত ক'রে তোলে, নজরুল ইসলামও বাংলাকাব্যের সুবিন্যস্ত ভাব-ঐতিহ্যকে চঞ্চল করেছিলেন। ওয়াল্ট্‌ হুইটম্যান নিজের রচনা সম্পর্কে একটি কথা ব'লেছিলেন Who touches this touches a man—এ গ্রন্থ যে স্পর্শ করবে সে একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবে। নজরুল কাব্য সম্পর্কেও সেকথা খাটে। তাঁর কাব্য অতি তীব্রভাবেই ব্যক্তিগত— most intensely personal.

নজরুল ইস্‌লাম সংক্রান্ত আলোচনা

বিভিন্ন পত্রিকায় নজরুল ইসলাম সম্পর্কে নানা সময়ে নানা আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে—ভবিষ্যতেও হবে। এগুলোর মধ্যে অল্প কিছু লেখা উল্লেখযোগ্য এবং অধিকাংশই গতানুগতিক—সাময়িক শ্রদ্ধাজ্ঞাপক। তাই সেগুলোর উল্লেখ না করে শুধুমাত্র কয়েকটি সঙ্কলন ও আলোচনা-গ্রন্থের উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে।

নজরুল প্রতিভা ঃ কাজী আবদুল ওদুদ

গ্রন্থটির প্রধান অংশ হচ্ছে কবির জীবনী—লেখক আবদুল কাদির। কাব্য সমালোচনা কাজী আবদুল ওদুদের। আলোচনা অংশটি স্বল্প পরিসরের, কিন্তু গাঢ়-বদ্ধ।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ঃ আবুল ফজল

নজরুল ইসলামের জীবনী—ছাত্রদের জন্য সরল ও মনোজ্ঞ করে লেখা।

নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা (১ম খণ্ড) ঃ শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী

দশটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নজরুল-কাব্যের বিভিন্ন-প্রকৃতির পরিচিতি ও আলোচনা।

কালের পুতুল ঃ বুদ্ধদেব বসু

এই গ্রন্থে নজরুল ইসলামের কবি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি আলোচনা আছে।

An Acre of Green Grass : Buddhadev Bose

একটি প্রবন্ধে নজরুল-কাব্যের আলোচনা করা হয়েছে।

সময় ও সাহিত্য ঃ কিরণশঙ্কর সেন

একটি প্রবন্ধে লেখক নজরুল ইসলামের প্রণয়-কবিতা ও বিদ্রোহ-কবিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস ঃ নাজিরুল ইসলাম

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ব্যপদেশে নজরুল ইসলামের কাব্য-বিচার।

শতাব্দীর কবি ঃ সত্যেন্দ্র মজুমদার

সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্তের কাব্য-আলোচনা।

কল্লল যুগ ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কল্লোল গোষ্ঠীর কবি নজরুল ইসলামের ব্যক্তি-পরিচিতি।

যাঁদের দেখেছি (২য় খণ্ড) ঃ হেমেন্দ্র কুমার রায়

নজরুলের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের ইতিহাস।

যাঁদের দেখেছি ঃ জসীমউদ্দিন

নজরুলের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের ইতিহাস।

কবিতা— নজরুল সংখ্যা (১৩৫১)

দিলরুবা— নজরুল সংখ্যা (১৩৫৬)

নির্দেশিকা

[অঙ্কগুলো পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশ ক'রছে]

অ

'অগ্রপথিক' ১৯,২০-২৫
'অগ্রপথিক' ও 'পাইওনিয়াস' ২০-২৫
অনুপ্রাস ৪০,৪৩-৪৪,৪৭
অনুপ্রাস ও মধুসূদন ৪৩-৪৪
অমিত্রাক্ষর ৪৩

আ

আবদুল ওদুদ (নজরুল সম্বন্ধে অভিমত) ৭
'আর কতদিন' ১৬০-১৬১

ই

'ইন্দ্রপতন' ১৩৫

এ

এড্‌গার এলেন পো ৪০-৪১
এলেন পো'র অনুপ্রাস ৪০
এ্যাঙ্গলো-সেক্‌সন কবিতা ৪৬
'এ্যারিওপ্যাজিটিকা' ৩৩

ও

'ওড্‌ টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' ২৮
ওয়াল্ট হুইটম্যান ও নজরুল ১৭-২৫

ক

কায়কোবাদ ৬
কিপলিং ও নজরুল ১৫২-১৫৩
কীট্‌স ৮,৩২
'কুলি' ৪
কোল্‌রিজ (Coleridge) ১২

খ

'খেয়া পারের তরণী' ৫৮

গ

'গেছে দেশ দুঃখ নাই…' ৫৮

ছ

ছন্দোতিরিক্ত (Hypermetric) ১৪,৪৯
ছন্দোতিরিক্ত ও 'বিদ্রোহী' ৪৯
'ছুঁৎমার্গ' ৩৮

জ

'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' ৩৭
'জিঞ্জীর' ১৯
'জুলফিকার' ১৪৫-১৪৯
জে, ডি, এণ্ডারসন ৫১

ঝ

'ঝড়' ৫৪

ট

টি, এস, ইলিয়ট ৮,১৫৬
টি, এস, ইলিয়ট ও ঐতিহ্য ১৫৬
'টিরেসিয়াস' ৮
টেনিসন ৫৫,১৫১

ত

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' ৪৩,৪৫
ত্রিপদী ৪২

দ

'দুঃশাসনের রক্তপান' ৩১

ধ

'ধর্মঘট' ৩৮

ন

নজরুল ও শব্দাংশগত ঝোঁক ৪৫,৫১
নজরুল ও হুইটম্যান ১৭-২৫
নজরুল কাব্যের ঐতিহ্য ১৫৫-১৬৩
নজরুলের ছন্দ ৩৯-৫৮
নজরুল কাব্যে উপমা ও রূপক ১৩৫-১৩৯,১৪৩,১৫৬-১৬৩
নজরুলকাব্যে সাময়িকতা ১৫০-১৫৪
'নবযুগ' ৩৭-৩৮
'নারী' ৪
'নিকটে'— ১৫৬
নিট্‌শে ১১-১২

প

পয়ার ৪৩,৫০
পরিমান-নির্ভর ছন্দ (Quantitative metre) ৪২
'পাইওনিয়ার্স' ২০-২৫
'পিয়ার্স প্লাওম্যান' ৪৪
'পূজারিণী' ১৫,৪৮,৫১

ফ

'ফণি-মনসা' ১৫০-১৫৪
'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' ৫৩,১৫৮-১৫৯

ব

'বনগীতি' ১৪০-১৪৪
বাক্যাংশগত ঝোঁক (Phrasal accent) ৪৮,৫১
'বারাঙ্গনা' ৪
বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ৩৪,৩৫
'বার্ড অব প্যাসেজ' ২০
'বিদ্রোহী' ৯১-৯৮, ৪৬-৫০
'বিদ্রোহী' ও 'পূজারিণী' ৯৫
'বিদ্রোহী' ও 'সং অব মাইসেল্‌ফ' ৯৭-৯৮

'বিদ্রোহী'র ছন্দ ৪৬-৫০
বিহারীলাল ১৫, ৪৪
'বীরাঙ্গনা কাব্য' ৪৫

ভ

'ভাঙ্গার গান' ৩০-৩২

ম

মধুসূদন দত্ত ১০,১৩,৪৩,৪৪
মধুসূদন দত্ত ও ছন্দ ৪৩-৪৫
'মরমী' ১৫৫
'মরু-ভাস্কর' ১৩৩-১৩৯
মিল্‌টন ৩৩
মীর মশার্‌রফ হোসেন ৬
মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ ৩৫,৩৬-৩৭
মুসলমান সাহিত্য-সাধক ৫-৬
'মুহাজেরীন হত্যার জন্য...' ৩৭
মোজাম্মেল হক ৬
মোহিতলাল মজুমদার ৯,৫১,৫৭
মোহিতলাল (নজরুলের ছন্দ সম্পর্কে অভিমত) ৫৭

য

'যুগবাণী' ৩৩-৩৮

র

রবীন্দ্রনাথ ২-৩,১৪,৪৪,৫৬
রবীন্দ্রযুগ ও নজরুল ২-৪
রবীন্দ্রযুগ ও সত্যেন্দ্রনাথ ৩
'রাজবন্দীর চিঠি' ২৭
রিফরমেশন ৭
রূপক ও নজরুল ১৪৩-১৪৪,১৪৮,
১৫৬-১৬৩
রোমাণ্টিসিজম ৭

ল

'লাটপ্রেমিক আলী ইমাম' ৩৭

শ

শব্দাংশগত ঝোঁক
(Stress rhythm) ৪৫,৫১
'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' ৩৭

স

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩
সনেট ৪
'সন্ধ্যা' ১৯
সাময়িকতা ও
'ইন্ মেমোরিয়াম' ১৫১-১৫৪
'সারদামঙ্গল' ১৫
'সিন্ধু' ৪৮
সংস্কৃত ছন্দ ৪২৫